সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের

সপ্ত গোস্বামী

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

শ্রীনির্মলেন্দু রায়
সঙ্কলিত

সপ্ত গোস্বামী

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

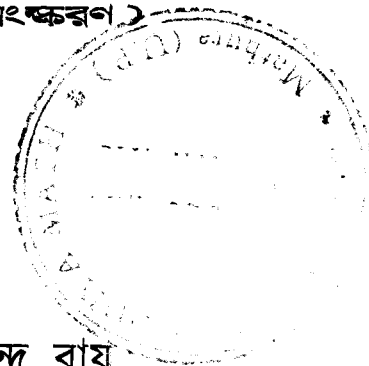

শ্রীনির্মলেন্দু রায়

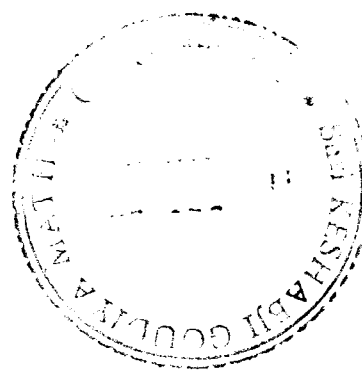

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, গৌরী সরণী
কলিকাতা-৪

২। প্রকাশক
৫ ৪, বিদ্যাসাগর নিকেতন
কলিকাতা-৬৪

৩। প্রভাত কার্য্যালয়
২সি, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯
এবং

৪। অন্যান্য প্রধান
পুস্তকালয়

এই পুস্তকের সকল স্বত্ব
সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরী মাতা প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে
অর্পণ করিলাম।
নিবেদন ইতি

বৈশাখ ২৯
১৩৮৯ সাল

শ্রীনির্মলেন্দু রায়

প্রকাশক ঃ
শ্রীনির্মলেন্দু রায়
জে ৪, বিদ্যাসাগর নিকেতন
সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০০৬৪

বৈশাখ, ১৩৮৯

মূল্য ঃ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আজন্ম ত্যাগের মহিমা প্রচারে উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে
সন্তানগণের আধ্যাত্মিক জীবন উদ্বুদ্ধ করিতে
সদাজাগ্রত
সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠায় সন্ন্যাসিনী গৌরী মাতার
প্রধান সহায়িকা
সন্ন্যাসিনী দুর্গা মাতার শ্রীচরণে
সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বর্ণিত সপ্ত গোস্বামীর
অপূর্ব জীবনকাহিনীর সংক্ষিপ্তসার
উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

প্রণত
শ্রীশ্রীদুর্গা মাতার সন্তান
নির্মলেন্দু রায়

নিবেদন

অনেক বৎসর পূর্বে এক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গা মাতার চরণতলে গুরুভ্রাতাগণ সহ সমবেত হইয়াছি। মাতা ঠাকুরাণী সন্ন্যাসিনী গৌরী মাতার জীবনকাহিনী "গৌরী মা" পুস্তক হইতে কিছু অংশ পাঠ করিতে আমাকে আদেশ করেন। দুর্গা-মা প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় ভক্তদের কাহিনী সম্বন্ধে পুস্তক পাঠের ও আলোচনার ব্যবস্থা করিতেন। আজও ঐ ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। এই উপলক্ষে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "সপ্ত গোস্বামী"ও পঠিত হইত। বৃন্দাবনধামের প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামীগণের ত্যাগ ও তপস্যার অপূর্ব কাহিনী সকলের মন আকৃষ্ট করিত। পুস্তকখানি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, উহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তখন হইতেই এই পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা আমার মনে উদয় হয়। সম্প্রতি সেই ইচ্ছা ফলবতী হওয়ায় ভক্তগণের হস্তে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তুলিয়া দিলাম। ইতি

বিনীত

লেখক

সূচীপত্র

১।	সপ্তগোস্বামী (প্রস্তাবনা)	১
২।	লোকনাথ গোস্বামী	৪
৩।	সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী	১০
৪।	শ্রীজীব গোস্বামী	৬০
৫।	শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী	৭৩
৬।	শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী	৭৮
৭।	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী	৮২

সপ্ত গোস্বামী

শ্রীবৃন্দাবন হিন্দুদের একটী প্রধান তীর্থধাম। ত্রেতা যুগে কোন এক সময়ে মধু নামে এক অনার্য রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরী মধুপুরী নামে খ্যাত হয়। মধুর পুত্র লবণ মহারাজ রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক বিজিত ও নিহত হওয়ার পর এই নগরীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রামায়ণে ইহার নাম মধুরা, কিন্তু হরিবংশে ও মহাভারতে ইহা মথুরা নামে বর্ণিত আছে। কালক্রমে ইহা আর্য সভ্যতার একটী কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে। বৃন্দাবন মথুরারই একাংশ। মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সময় অর্জ্জুনপৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া যান। মথুরামণ্ডলে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রজনাভ মাতৃ-আজ্ঞায় প্রপিতামহের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য ৺গোবিন্দ, ৺গোপীনাথ ও ৺মদনমোহন এই কয়েকটী বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠে।

অতঃপর বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে হিন্দুধর্মের প্রভাব ম্লান হইয়া পড়ে। হিন্দু দেবমন্দিরসমূহ ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মথুরা নগরী বৌদ্ধদের একটী পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। বৌদ্ধ যুগের পর মুসলমান আক্রমণে হিন্দুরা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে পলায়ন করে এবং বৃন্দাবন ক্রমশঃ জনবিরল হইয়া পড়ে। হিন্দু সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল কালের নিদর্শন দেববিগ্রহসমূহ কোথায় কোন্ ধ্বংসস্তূপের নীচে লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব বৃন্দাবনে আসিয়া উহা বনময় দেখেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় বহু

কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিম্বার্ক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নিম্বার্ক একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রামানুজাচার্যের পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হন। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি বাস করিতেন বৃন্দাবনে। এই সব বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কোন দিনই নষ্ট হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে উহা ৮৪ ক্রোশ পরিমিত এক বিস্তৃত বনভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। উহার ভিতর নির্জনে সাধনভজনের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে সাধকগণ বাস করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এক সময়ে বৃন্দাবনে আসেন। অল্প সময়ে তীর্থ দর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বৃন্দাবনকে বনময় দেখিয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কোন্ লীলা কোন্ স্থানে হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দও বৃন্দাবনের ঐ একই অবস্থা দেখেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতেই পাঠান নৃপতিগণ গৌড় দেশ শাসন করিতেন। হুসেন শাহের রাজত্ব কালে উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দুগণ তাঁহাদের অধীনে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। তৎকালে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি শিক্ষার পীঠস্থান হইয়াছিল। কিন্তু সামাজিক অনাচার এবং ধর্মের গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষকে নরকের পথে চালিত করিতেছিল। সামান্য দুচার জন সাধুপুরুষ যাঁহারা ছিলেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের পরিত্রাণের জন্য অবিরত ভগবানকে ডাকিতেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। অতি অল্প সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য সমস্ত দেশবাসীকে চমৎকৃত করে। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভের জন্য অসংখ্য ছাত্র নবদ্বীপে সমবেত হইতে থাকে। যৌবনে তিনি পিতার পিণ্ড দিতে গয়াতে যান এবং তথায় ঈশ্বর পুরীর নিকট কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত হন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের চিন্তা সর্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। তিনি লক্ষ্য করিলেন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কাহিনীর স্মৃতি সাধারণের মনে মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন

ক্ষেত্রের উদ্ধার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। সন্ন্যাস লইবার পর হইতেই এ-বিষয়ে তিনি সক্রিয় হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি নিজ ভক্তগণের ভিতর হইতে উপযুক্ত কয়েকজনকে নির্দ্দেশ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলির উদ্ধার সাধন এবং নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের আকরস্থান হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সংসারত্যাগী, অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী ভক্তেরা এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই পরবর্তীকালে গোস্বামী আখ্যা পান। তাঁহাদের নাম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ
এই সব গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ।"

লোকনাথ গোস্বামী

লোকনাথ গোস্বামী যশোহর (বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলায় তালখড়ি গ্রামে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড় ছিলেন। লোকনাথের পিতা পদ্মনাভ এবং মাতা সীতা দেবী। কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ তাঁহার পূর্ব পুরুষ[১]। পদ্মনাভের ৪টী পুত্র—ভবনাথ, প্রগল্‌ভ বা পূর্ণানন্দ, লোকনাথ ও রঘুনাথ।

পদ্মনাভ যখন বালক তখন বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র-স্থল। নবদ্বীপের নিকটে ফুলিয়ায় পদ্মনাভের জ্ঞাতিবর্গ বাস করিতেন। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান শান্তিপুরে, তৎকালীন বিখ্যাত অধ্যাপক "বেদপঞ্চানন" উপাধিধারী অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বাস করিতেন। পদ্মনাভ তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হন। এই সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব এবং অসাধারণ পণ্ডিতরূপে দেশময় তাঁহার খ্যাতি এক অপূর্ব ভাবের বন্যায় চতুর্দিক প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গয়াতে তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ঈশ্বর পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। সমবেত শিষ্যগণের নিকট অদ্বৈত আচার্য প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন—কখনও শান্তিপুরে আবার কখনও নবদ্বীপে। ক্রমে পদ্মনাভ পরম ভক্ত হইয়া পড়েন এবং অদ্বৈত আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর কখনও তালখড়িতে আবার কখনও শান্তিপুরে আসিয়া ভক্তিচর্চা করিতেন। লোকনাথ পদ্মনাভের পুত্র। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনিও ১৪/১৫ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের শিষ্য হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলামৃত

পদ্মনাভের অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। তিনি পুত্র লোকনাথকেও শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। লোকনাথ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সটীক শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলেন। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত লোকনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথ ও গদাধরের পাঠ শুধু শুনিয়াই শ্লোকার্থ কণ্ঠস্থ করিতেন। তীক্ষ্ণ মেধাবী শ্রীগৌরাঙ্গের এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া লোকনাথ অভিভূত হইলেন। লোকনাথের ভাগবতে অপূর্ব ব্যুৎপত্তি জন্মিল। তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। তদবধি লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট চিরবিক্রীত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার ভাবী জীবনের কর্মপথ এই ভাবেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িল।

অতঃপর লোকনাথ তালখড়িতে নিজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য লোকনাথ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তালখড়িতে আসাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার গর্ভবাসকালে পিতামহী কলাবতী দেবী শচী দেবীকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ গর্ভস্থ সন্তান যেন কোন এক সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পিতামহীর ইচ্ছা পূরণের জন্যই তিনি নবদ্বীপ হইতে বাহির হন। গন্তব্য পথে তালখড়ির পার্শ্ব দিয়া তিনি চলিলেন এবং লোকনাথের সন্ধান করিলেন। লোকনাথ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য পিতা পদ্মনাভকে শ্রীগৌরাঙ্গসকাশে পাঠাইয়া দেন। আদর-অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তালখড়িতে কয়েকদিন আনন্দোৎসব এবং তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। সকলেই নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার

গভীরতা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তালখড়ি হইতে তিনি লোকনাথকে সঙ্গে করিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকালে হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অবশেষে শ্রীহট্টে বুরুগঙ্গা বা বড়গঙ্গায় আসিয়া পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতামহী কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্ট জেলায় ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত দত্তরালি গ্রামে হইলেও এই সময় তিনি জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণের সহিত বুরুঙ্গাতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ একই পথে লোকনাথ সহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তালখড়িতে লোকনাথকে নিজগৃহে রাখিয়া যান। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাতের কালে কি এক দিব্য প্রেরণা লোকনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তিনি অপূর্ব আনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের পর মানসিক অস্থিরতায় কষ্ট পাইতে থাকিলেন। সংসারে আর কিছুই ভাল লাগিল না। দারুণ বৈরাগ্য তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। তাঁহার বয়স তখন ২৫ বৎসর। বিবাহ করেন নাই। পিতামাতা উভয়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সংসারের সব বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৪৩১ শকে অগ্রহায়ণ মাসে এক রাত্রে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে জন্মের মত গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে নবদ্বীপ পৌঁছিয়া প্রভুর বাড়ীতে গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তখন প্রেমোন্মাদের অবস্থা—স্বাভাবিক অবস্থায় ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় বিভোর থাকেন। লোকনাথ উপস্থিত হইলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "লোকনাথ, তুমি আসিয়াছ ?"

লোকনাথের ইচ্ছা ছিল প্রভুর চরণপ্রান্তে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা অন্যরূপ। লোকনাথকে বলিলেন, "লোকনাথ, শ্রীবৃন্দাবন ধাম অরণ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। তুমি গিয়া তথাকার লুপ্ত লীলাক্ষেত্রসমূহ উদ্ধার কর।" পরদিনই তিনি লোকনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, 'তোমার পর আরও ভক্তগণ যাইবেন, আমিও যাইব। সকলে মিলিয়া

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রসকল প্রকাশ করিব। ভক্তিশাস্ত্রের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচার করিব। প্রভুকে তখনই ছাড়িয়া যাইতে লোকনাথের প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু কি করিবেন, প্রভুর সঙ্কল্প অটল। লোকনাথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, প্রভু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন বৃন্দাবনে অক্ষয় বটের সন্নিকটে চীর ঘাটে (বস্ত্রহরণের ঘাট) গিয়া কেলিকদম্বকুঞ্জে বাস করিতে। পাঁচ দিন মাত্র নবদ্বীপে কাটাইয়া লোকনাথ রওনা হইলেন। তাঁহার সহিত গদাধর প্রভুর এক শিষ্য ভূগর্ভও জন্মের মত বঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত এ জীবনে আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

এই দুই কৌপীনধারী ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে রাজমহল এবং তথা হইতে একটু দূরে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ণিয়া দিয়া অনেক দিন পরে অযোধ্যা, তারপর লক্ষ্ণৌ এবং তথা হইতে আগ্রায় আসিয়া যমুনা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তারপর দুই দিনের মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। নবদ্বীপ ছাড়িয়া প্রায় তিন মাস পরে তাঁহারা শ্রীধামে পৌঁছিলেন।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রথমতঃ মথুরায় ও পরে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণলীলার স্থানসমূহের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। পুরাণে যে সব বর্ণনা আছে তাহার সহিত কতকটা মিল করিয়া কোন কোন স্থান চিনিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর সংবাদ পাইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে কিছুদিন বাস করিয়া দক্ষিণ ভারতের তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়াছেন। সন্ন্যাসের পর তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকনাথ ও ভূগর্ভ পাগল হইলেন। বৃন্দাবনে তিষ্ঠিতে না পারিয়া উভয়ে প্রভুর সন্ধানে দক্ষিণ দেশে চলিলেন। পদব্রজে দূরদেশে যাইবার কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উভয়ে দক্ষিণদেশে প্রভুর সন্ধানে নানা তীর্থে ঘুরিয়া তাঁহার সন্ধান পাইলেন

না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণে প্রায় দুই বৎসর ঘুরিয়া নীলাচলে ফিরিলেন। তথায় আরও কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা হইয়া গৌড় পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর (১৫১৪ খৃঃ) নীলাচল হইতে ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবন আসিলেন। কিন্তু তখনও লোকনাথ ও ভূগর্ভ দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেখা হইল না। প্রভু নীলাচলে ফিরিবার পথে মথুরা হইয়া যখন প্রয়াগে আসিলেন তখন লোকনাথ ও ভূগর্ভ বৃন্দাবনে ফিরিয়াই প্রভুর প্রয়াগে অবস্থানের কথা শুনিয়া তথায় যাইবার উপক্রম করিলেন। পথে একরাত্রে লোকনাথ প্রভুকে স্বপ্নে দেখিলেন। প্রভু যেন তাঁহাকে বলিতেছেন 'লোকনাথ, আমি সর্বদা তোমার কাছেই আছি, তুমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইও না।' লোকনাথের মন শান্ত হইল। প্রয়াগের পথ হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লোকনাথ ও ভূগর্ভ কিছুদিন ছত্রবনের পার্শ্বে শ্রীকিশোরী কুঞ্জের নিকট একটি নির্জন স্থানে বাস করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে এক বিগ্রহ লাভ করেন। এই বিগ্রহ "শ্রীরাধাবিনোদ" নামে তাঁহার সেবা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি নিজে কাঁন্থা ও কৌপীনধারী—বাসস্থান কোন গাছতলায়। কোন ভক্তের একটী কুটীর নির্মাণের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বিগ্রহকে বৃক্ষকোটরে রাখিয়া তুলসী ও জলে পূজা, শাকান্ন ভোগ এবং পুষ্পশয্যায় শয়ন করানই ছিল তাঁহার সেবার ব্যবস্থা। একটী ঝোলায় বিগ্রহ লইয়া, ঝোলাটী গলায় ঝুলাইয়া বনে বনে ঘুরিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ যুবকদ্বয়ের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি পড়িল। তাহারা ফলমূল আনিয়া দেবসেবার জন্য দিত। কিন্তু লোকনাথ প্রত্যহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ফিরাইয়া দিত। ক্রমে আরও ভক্তেরা বৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীমন্নারায়ণ ভট্ট ১৫৫৩ খ্রীঃ সংস্কৃত ভাষায় "শ্রীব্রজবিলাস" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে শ্রীলোকনাথ

কর্ত্তৃক ৩৩৩টী বনের আবিষ্কারের কথা আছে। শ্রীরূপ সনাতনের বৃন্দাবন আগমনের পর লোকনাথ এই আবিষ্কার তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিয়া যে সব স্থানে বাস করিতেন তাহাদিগকে কুঞ্জ বলিত। ক্রমে বৃন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে ভরিয়া গেল। সাধকেরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ভিন্ন কুঞ্জের বাহিরে আসিতেন না। বৃন্দাবনে এখন যেখানে গোকুলানন্দ আশ্রম সেই স্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। শেষের দিকে তিনি সাধনভজন ও দেবসেবা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। লোকনাথ কাহাকেও দীক্ষা দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন। এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে যিনি বিচ্যুত করিয়া-ছিলেন তাঁহার নাম নরোত্তম। কিন্তু ইহা এক ভিন্ন কাহিনী। শতাধিক বৎসর পূর্ণ হইলে লোকনাথ অপ্রকট হইলেন। বর্ত্তমান গোকুলানন্দ মঠে তাঁহার সমাধি আছে। তাহার পার্শ্বে নরোত্তম ঠাকুরের সাধনাসন।

সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর স্মৃতি কালপ্রভাবে ক্ষীয়মাণ। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধে সঠিক এবং ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহাদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছিল সেগুলির অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য। বর্ত্তমানে যে সকল পুস্তকে তাঁহাদের বিষয়ে কিছু জানা যায় তাহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস', দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বৃহৎবঙ্গ', শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত 'অমিয় নিমাইচরিত'। যে সকল দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের নাম এই প্রসঙ্গে করা উচিত তাহাদের একটি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'সপ্ত গোস্বামী'। এই পুস্তক রচনায় গ্রন্থকার রামযাদব বাগ্‌চি প্রণীত "শ্রীবৃন্দাবনরহস্য", পুলিনবিহারী দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বৃন্দাবনকথা,' নরহরি চক্রবর্ত্তী-কর্ত্তৃক বিরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' এবং নিত্যানন্দ দাস লিখিত 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছেন। বর্ত্তমান আখ্যায়িকা প্রধানতঃ সতীশচন্দ্র মিত্রের "সপ্ত গোস্বামী" অবলম্বনে রচিত।

সনাতন ও রূপ সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তির অভাব নাই যিনি মনে করেন যে, এই দুই ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেও তৎকালে গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন। প্রথম হইতেই স্মরণ রাখা দরকার যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নবাব সরকারে দবীরখাস এবং সাকর মল্লিক নামেই দুই ভ্রাতার পরিচয় ছিল। নাম দুইটীর ভিতর হিন্দু নামের কোন ছোঁয়াচ নাই। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইঁহাদের সনাতন ও রূপ নাম দেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেও ইহাদের পিতৃদত্ত নাম ছিল যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। কিন্তু সে নামে

তাঁহাদের কোথাও পরিচয় নাই। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বের ঘটনা প্রসঙ্গেও তাঁহাদিগকে সনাতন ও রূপ এই দুই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই সকল ঘটনা পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হয়। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কি সূত্রে তাঁহাদের কর্ণাট ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন হয়, গৌড়ের বাদশাহের অধীনে কি যোগ্যতায় উচ্চপদে চাকুরী পান, গৌড়ের বাদশাহের প্রিয় অমাত্য হইয়াও এবং আচার ব্যবহারে মুসলমানভাবাপন্ন হইয়াও, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত যোগাযোগ কেন এবং কিভাবে হইয়াছিল, কি কারণে গৌড়ের বাদশাহের এই দুই অমাত্যকে মহাপ্রভু বৃন্দাবন উদ্ধারের কার্যে এবং বৈষ্ণবসাহিত্য সঙ্কলনের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনে এইগুলি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীজীব গোস্বামী সনাতন ও রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র—বৈষ্ণব শাস্ত্র সঙ্কলনে সুদক্ষ। ইনি "লঘুতোষণী" নামে শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীজীব গোস্বামী নিজ বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ সর্বজ্ঞ বা জগদ্‌গুরু তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। বহু বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই তিনি এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই পাণ্ডিত্যের ধারা তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। সর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ সমগ্র যজুর্বেদ পাঠ করিয়া সুপণ্ডিত হন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর ও কনিষ্ঠ হরিহর। রূপেশ্বর বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং হরিহর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অনিরুদ্ধ নিজ রাজ্য দুই পুত্রের ভিতর ভাগ করিয়া দিলেও হরিহর যুদ্ধে রূপেশ্বরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হইয়া রূপেশ্বর পূর্ব দিকে গমন করেন

এবং তথায় তাঁহার মিত্র রাজা শিখরেশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। শিখরেশ্বরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব তিনি বরেন্দ্রভূমির কোন এক রাজা ছিলেন। এইভাবে সনাতনের পূর্বপুরুষ কর্ণাট হইতে বরেন্দ্রভূমিতে আগমন করেন। এই মিত্র রাজার রাজ্যে বাস করার কালে রূপেশ্বরের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম পদ্মনাভ। বড় হইয়া পদ্মনাভ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। এই সময় উত্তর বঙ্গের ভাতুরিয়া পরগণার এক জমিদার, রাজা গণেশ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়াধিপতি আজম শাহের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের কর্তা ছিলেন। সুপণ্ডিত বলিয়া পদ্মনাভ রাজা গণেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে পদ্মনাভ গৌড়রাজ সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন। রাজা গণেশ বহুশাস্ত্রদর্শী ছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের সমাদর করিতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসে' লিখিয়াছেন—গণেশের চক্রান্তে আজম শাহ এবং কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পৌত্র নিহত হইলে গণেশ কিছু দিনের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার উৎসাহে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী রামকেলি গ্রামে সমবেত হইয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। রামকেলি এইরূপে পণ্ডিতগণের একটী পীঠস্থান হইয়া পড়ে।

অদ্বৈত আচার্যের পিতামহ শ্রীহট্টনিবাসী নরসিংহ নাড়িয়াল রামকেলিতে আসেন। পদ্মনাভ, নরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রাজা গণেশের রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। এই পদ্মনাভই হইলেন পরবর্ত্তী কালের দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের অথবা সনাতন ও রূপের প্রপিতামহ। ইঁহাদের কর্মজীবন পর্যালোচনা করিতে হইলে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা অবহিত হওয়া প্রয়োজন। রাজা গণেশের পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপর দনুজমর্দন দেব নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পাণ্ডুয়ায় আসিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গৌড়ের হিন্দু অমাত্যগণ সকলেই তখন তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। দেশে তখন যুদ্ধ-বিগ্রহজনিত

অশান্তি ছড়াইয়া পড়ে। পদ্মনাভ স্বীয় পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য দনুজমর্দনের রাজ্য মধ্যে গঙ্গাতীরে নবহট্ট বা নৈহাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। দনুজমর্দন পাণ্ডুয়ায় তিন বৎসর রাজত্ব করার পর পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পূর্বমুখে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে (বর্ত্তমান বরিশালে) আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এদিকে গৌড়ের সিংহাসনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে ছিল। হিন্দুরা দনুজের বংশীয় মহেন্দ্র দেবকে রাজতক্তে বসাইলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে পাঠানেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া গৌড়ে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এই সময়ের একটা লক্ষণীয় বিষয় ছিল—মুসলমান নবাবগণ রাজত্ব পরিচালনার জন্য অনেক সময় উচ্চশিক্ষিত হিন্দু অমাত্য নিয়োগ করিতেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রভাবে গৌড়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। মুকুন্দের একমাত্র পুত্র কুমারদেব। তিনি অতি শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সময় "পীরালি"র অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতেছিল। নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দুগণের নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। কুমারদেব নবদ্বীপ ছাড়িয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দনের বংশীয় হিন্দুর রাজত্বে বাস করিতে গেলেন। দনুজমর্দন তাঁহার পূর্বপুরুষের পৃষ্ঠপোষক। সেই পরিচয়ে তিনি তথায় বাসভূমি পাইলেন। এই স্থানেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ তিন পুত্রের জন্ম হয়। উহাদের নাম অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। ১৪৬৫ খৃঃ অমর, ১৪৭০ খৃঃ সন্তোষ এবং ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই তিনজনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও অনুপম রাখিয়াছিলেন।

বল্লভের জন্মের অব্যবহিত পরে কুমারদেব অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ও লোকাতীত চরিত্রের উত্তরাধিকারী হইয়া জগৎকে আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত

ও পবিত্র করিয়াছিল। কুমারদেবের মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন। তিনি এবং বাদশাহের অন্যান্য হিন্দু কর্মচারী রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন। মুকুন্দ তাঁহার পৌত্রগণকে বাক্‌লা হইতে রামকেলিতে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই গ্রামের নাম ছিল 'কানাই নাটশালা'। এই স্থানে বহু দেব-দেবীর মন্দির ছিল এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন ও রামলীলার ব্যাখ্যা হইত। মুকুন্দদেব পৌত্রগণের শিক্ষার সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনীতে সনাতন নিজ গুরুগণের নাম দিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥

এখানে বাসুদেব বলিতে প্রখ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমকে এবং বিদ্যাবাচস্পতি বলিতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতিকে বুঝাইতেছে। তাঁহারা মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বাসুদেব মিথিলায় শিক্ষা লাভ করিয়া অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হওয়ার পর উভয় ভ্রাতা নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। সনাতন ও রূপের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমে সম্ভবতঃ উহাদের পিতামহ মুকুন্দের তত্ত্বাবধানে রামকেলিতে রামভদ্র ও বাণীবিলাসের নিকট ব্যাকরণাদিতে সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁহারা দর্শন এবং দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে যান। তথায় কিছুদিন বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট এবং নিয়মিতভাবে তাঁহার ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন করেন। ক্রমে তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন। মুকুন্দের উৎসাহে তাঁহার পৌত্রগণেরও সম্ভবতঃ রাজসরকারে চাকুরী করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে নবাব সরকারে উচ্চপদে যোগদান করিতে হইলে আরবী ও ফারসী ভাষা উত্তমরূপে অধিগত

হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ ফকরউদ্দিনের নিকট যান এবং ভাষা দুইটী সুন্দররূপে শিক্ষা করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে গৌড়ের অধিপতি বারবক শাহ রাজ্য ও রাজ-অন্তঃপুর রক্ষার জন্য বহু হাবসী খোজাকে চাকুরী দেন। দলপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে উহাদের প্রতাপবৃদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বারবকের পৌত্র ফতে শাহ যখন গৌড়ের নবাব তখন এই ষড়যন্ত্র চরমে উঠিলে হাবসীদের হস্তে ফতে শাহ নিহত হইলেন। পরবর্ত্তী ৬/৭ বৎসর হাবসীরা রাজত্ব করে। অবশেষে হুসেন শাহ, যিনি শেষ হাবসী নবাবের উজীর ছিলেন তিনি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। এই সময় অমর, সন্তোষ ও বল্লভ অল্পবয়স্ক বালক হইলেও অসামান্য বিদ্যা ও বুদ্ধির জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অমর (সনাতন)-এর বয়স তখন ১৮ বৎসর। হাবসীঘটিত আবর্ত্তে বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি হুসেন শাহের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ফারসী ভাষায় অমরের অনর্গল কথা বলিবার দক্ষতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতামহের মৃত্যুর পর অমর তাঁহার পদটী পাইলেন। এই পদের নাম হইল "দবীর খাস"। সন্তোষ ও বল্লভ ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিজ-নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে ক্রমে এই দুই ভ্রাতাও নবাব সরকারে উচ্চপদ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সন্তোষ (রূপ)-এর পদের নাম হইয়াছিল "সাকর মল্লিক।"

অমর (সনাতন) অথবা সন্তোষ (রূপ)—কে দবীর খাস, কে সাকর মল্লিক এ বিষয়ে কিছু মতবিরোধ আছে। শ্রীসুকুমার সেন চৈতন্যচরিতামৃতের লঘুসংস্করণের টিপ্পনীতে রূপকে দবীর খাস বলিয়াছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুরও (চৈতন্যভাগবতে) এই মত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (১৯৪০ খৃঃ) ৭২, ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন……সনাতন ও রূপ গোস্বামী হুসেন শাহের অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। পদবলাৎ ইহাদের নাম ছিল যথাক্রমে দবীর খাস (Private Secretary) এবং সাকর

মল্লিক (Chief Secretary)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলার ইতিহাসে" (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৪৪) বলিয়াছেন—'রূপ ও সনাতন নামক ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেন শাহ সনাতনকে দবীর খাস (Private Secretary) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং রূপকে সাকর মল্লিক উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।' সতীশচন্দ্র মিত্র ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি যশোহর ও খুলনার ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি "সপ্ত গোস্বামী" নামক গ্রন্থে রূপ ও সনাতন সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বিশদ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে সনাতনকেই দবীর খাস বলিয়াছেন এবং পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—'বিশ্বকোষে সনাতনের উপাধি সাকর মল্লিক করা হইয়াছে উহা ভুল।' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমর (সনাতন), নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে ১৮ বৎসর বয়সেই নবাবের মন্ত্রী হন। নবাবও প্রথম হইতে তাঁহার পরিচয় পাইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। অনেক গোপনীয় বিষয়ও তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই কারণে তাঁহাকে "দবীর খাস" বলিতেন। রাজকার্যে সনাতনের উপর নবাবের নির্ভরতা কতদূর ছিল তাহা একটা ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। পরবর্ত্তী কালে রূপ যখন রাজকার্যে বীতরাগ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে চলিয়া যান এবং সনাতনও ঐ পথ অবলম্বন করিবেন ভাবিতেছিলেন তখন নবাব হুসেন শাহ দীর্ঘদিন সনাতনকে রাজদরবারে অনুপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার বাসভবনে যান এবং সনাতনের মনোভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—
(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৯শ অধ্যায়)

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্যকাম সব কৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥

চৈতন্য মহাপ্রভুর রামকেলিতে আগমনে বহুলোক তাঁহার পাশে

সমবেত হইয়া দিবারাত্র কীর্ত্তন করিতে থাকে। হুসেন শাহ সংবাদ পাইয়া কেশব ছত্রীকে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিকট প্রাপ্ত সংবাদে তুষ্ট না হইয়া দবীর খাসকে পাঠাইয়া দেন। কারণ দবীর খাসকে নবাব খুব বিশ্বাস করিতেন। এদিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত অতি দীন বেশে অমর (সনাতন) ও সন্তোষ (রূপ) সাক্ষাৎ করেন এবং নিজেদের মানসিক অবস্থার কথা তাঁহার গোচর করেন—(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ)

শুনি মহাপ্রভু কহেন শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥

যেখানে দুই ভ্রাতা উপস্থিত সেখানে বড়ভাইকেই সম্বোধন করা হয়, সুতরাং দবীর খাস বড় ভাই অর্থাৎ অমর বা সনাতন।

অতএব রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মিত্র—দুই ঐতিহাসিকের মত গ্রহণ করাই সমীচীন।

যাঁহাদের মস্তিষ্কবলে সুলতান হুসেন শাসন-সংস্কার করিয়া প্রজার শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সনাতন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। রূপও রাজস্ববিভাগে বড় চাকরী করিতেন, হুসেন তাঁহাকে সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত)-মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। বল্লভেরও মল্লিক উপাধি ছিল, তিনি গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু সনাতনের পদগৌরব সকলের উপরে, তিনি সুলতানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে অনেক সময় সুলতানের যুদ্ধাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইত। মুসলমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে গিয়া সনাতন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন—দবীরখাস হিন্দু না মুসলমান অনেকেই জানিত না।

যখন হুসেনের রাজসভায় সনাতন ও রূপ মহামন্ত্রী তখন তাঁহাদের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। কয়েকটী প্রদেশে সামান্য কর দিয়া উঁহারা রাজ্যভোগ করিতেন। উহাদের মধ্যে একটী প্রদেশ ছিল ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসুফপুর (চেঙ্গুটিয়া পরগণা)। এই স্থানে ভৈরবনদের তীরে তাঁহারা বিস্তীর্ণ রাজপুরী নির্মাণ করেন। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে তাঁহাদের

পৈতৃক বাড়ী ছিল, তথা হইতে গৌড়ে যাইবার পথের প্রায় মধ্যস্থলে তাঁহাদের নূতন বাড়ী করিলেন। ভক্তিরত্নাকরে (৪০ পৃঃ) আছে

"যশোহরে ফতেহাবাদ নামে গ্রাম হয়।
যাতায়াত হেতু তথা করিলা আলয়॥"

এই স্থানের নাম প্রেমভাগ বা পমভাগ। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বেও রূপ-সনাতনের প্রাচীন বাড়ীর কিছু ভগ্নাবশেষ, ৬।৭টি দীঘি, মঠবাড়ী প্রভৃতি সেখানে দেখা যাইত।

গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলি গ্রামে তাঁহাদের বাসের জন্য নির্মিত অট্টালিকার সামান্য ভগ্নাবশেষ, সনাতন সাগর নামক দীঘি, বিখ্যাত সোনা মসজিদের উত্তরে রূপকৃত রূপসাগরের ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলীর কিছু-কিছু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু, সনাতন, রূপ ও বল্লভের নির্মিত মন্দিরগুলির কোন চিহ্ন নাই।

এই রামকেলিতে সনাতনের ইন্দ্রপুরীতুল্য বাটীতে সভা বসিত। সে সভায় রাজনৈতিক বিচার হইত না। সেখানে সর্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সঙ্গে সনাতন ও রূপ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা উভয়েই তীক্ষ্ণ মেধাবী ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। এইভাবে উচ্চ রাজকার্য হইতে যেটুকু অবসর মিলিত ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্রচর্চায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চতুষ্পাঠী চলিত। সংস্কৃত সাহিত্যের এবং ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন হইত। দূরদেশ হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা আসিলে সনাতন ও রূপ নিজ বাটীতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সশ্রদ্ধ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিতেন। সুদূর কর্ণাট দেশ হইতেও তাঁহাদের নিজসম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাও আসিতেন। উভয় ভ্রাতা ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠান করিতেন। বহু বিগ্রহ রামকেলীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের কোন সীমা ছিল না, কিন্তু বিধর্মী রাজার অধীনে রাজকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া অনেক সময় নিজ-নিজ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে চলিতে হইত। তখন তাঁহারা অবিরত

অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন। উহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইতেছিল।

গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িষ্যাতে মুসলমানগণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ইসমাইল গাজিকে সসৈন্যে ওড়িষ্যা আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ওড়িষ্যার তদানীন্তন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তখন দক্ষিণ ভারত অভিযানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ইসমাইল গাজি কটক দখল করিয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হয়। মুসলমান সৈন্যগণ বহুস্থানের হিন্দুদের দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির ভগ্ন করিয়া দেশ ছারখার করে। পুরীর পাণ্ডাগণ দেববিগ্রহসকল চিল্কা হ্রদের জলে লুকাইয়া রাখে। এই অভিযানে হুসেন শাহের প্রধান সচিব বা দবীর খাস (সনাতন) সঙ্গে যাইতে বাধ্য হন। হিন্দুর দেবতা ও ধর্মের উপর পাঠান সৈন্যের একচেটিয়া অত্যাচার সনাতন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি দারুণ মর্মপীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলেন। যত উচ্চ পদেই তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকুন না কেন বিধর্মী রাজার অধীনে চাকরীর প্রতি তাঁহার মমতা দূর হইয়া গেল। রূপ ও অনুপম এই দুই ভ্রাতার মনোভাবও সনাতনের মানসিক অবস্থার অনুরূপ। একদিকে বিষয়-বৈভব, অপরদিকে স্বধর্মবিরোধী আচরণ—ইহারই আবর্তে পড়িয়া তাঁহারা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন।

এই সময় তাঁহারা সংবাদ পাইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়াছেন এবং পাপী-তাপী সকলকেই কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিতেছেন। সনাতন যেন নিমজ্জমান অবস্থায় উদ্ধারের অবলম্বন পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার মত বিষয়ভোগী ম্লেচ্ছাচারীর কি মুক্তিলাভের কোন পন্থা নাই? মহাপ্রভু সেই পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে একটী শ্লোক লিখিত ছিল—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ রসায়ণম্॥

শ্লোকটী প্রাচীন বেদান্ত গ্রন্থ "পঞ্চদশী" হইতে গৃহীত। এই শ্লোকের সাহায্যে তিনি সনাতনকে বুঝাইলেন—আগ্রহ থাকিলে বিষয়কর্মের মধ্যে থাকিয়াও পরমানন্দের স্থান শ্রীভগবানের পদ লাভ করা যায়।

সনাতনের পত্র হইতে তিনি তাহার প্রকৃতি বুঝিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে সনাতনের প্রতি কৃপাদান করিতে চলিলেন। প্রথমে নবদ্বীপে আসিয়া সনাতনের গুরু রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে একদিন রহিলেন, তাঁহার নিকট সনাতনের অনেক তথ্য জানিলেন। তারপর গৌড়ের পথে বৃন্দাবনে চলিলেন। ইহার কারণ সনাতনের আকর্ষণ, আর্ত ভক্তের প্রাণের টান তাঁহার প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গৌড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য লোকের জনতা সংকীর্তন করিতে করিতে চলিতেছিল। সনাতন ও রূপের নিকট সকল সংবাদ পৌঁছিল। তাঁহাদের ভয় হইল রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে মুসলমান জনগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে। নবাবের নিকটও সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী দবীর খাসকে বলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামকেলি হইতে একটু দূরে থাকিতে একদিন রাত্রিকালে সনাতন ও রূপ দীনহীন কাঙ্গালের বেশে 'দন্তে তৃণ লইয়া' তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পদপ্রান্তে পড়িয়া বারংবার সজলনেত্রে দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু উহাদিগকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই। পরিচয় পাওয়া মাত্র উঠিয়া আসিয়া উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। যে উত্তর দিয়াছি তাহাও বোধ হয় মনে আছে। বিষয়কার্যে বিব্রত থাকিলেই যে ধর্মসাধনা হয় না তাহা নহে। তোমাদের দুই ভ্রাতার ব্যাকুল চিত্তের আকর্ষণেই তোমাদের পানে ছুটিয়া আসিয়াছি, নতুবা গৌড়ে আসার আমার অন্য প্রয়োজন ছিল না।" মহাপ্রভু আরও বলিলেন, "যখন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তোমাদের এমন দীনতা আসিয়াছে,

তখন নিশ্চয়ই অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আজ হইতে তোমাদের নাম সনাতন ও রূপ রাখিলাম।"

রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বহুলোক সর্বদা কীর্ত্তনে মত্ত থাকিত। কীর্ত্তনের শব্দ বহু দূরে পৌঁছিত। নবাব হুসেন শাহ খবর পাইলেন। কে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছে। নগর কোতোয়াল কেশব খাঁ নবাবের দিক হইতে অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার জন্য বলিলেন, 'কিছু না, এক সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটন করে—সঙ্গে দুইচার জন লোক আছে।' নবাব তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি হিন্দুবিদ্বেষী। হিন্দুমন্দির ও দেববিগ্রহ কিছুদিন আগেও ওড়িষ্যাতে তাহার সৈন্যগণ ভগ্ন করিয়াছে, কিন্তু কি এক দৈবী শক্তিতে হুসেনের মনোভাব অন্যরূপ হইল। তিনি ভাবিলেন—

বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন কেহ ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন॥

(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ)

চৈতন্যদেব কয়েকদিন রামকেলিতে থাকিয়া সকলকে বিমোহিত করিলেন। সনাতন ও রূপ সস্ত্রীক আসিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিলেন। মহাপ্রভু যেখানে আসন পাতিয়াছিলেন সেখানে এখনও একটী উচ্চ বেদীর উপর তাঁহার চরণচিহ্নসম্বলিত একখানি প্রস্তর আছে। একটী মন্দিরে নিতাই, চৈতন্য ও অদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তির সঙ্গে ৺মদনমোহনের বিগ্রহ নিত্য পূজিত হইতেছেন। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার জন্য এখনও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে রামকেলিতে একটী বিরাট মেলা বসে এবং বহু বৈষ্ণব-ভক্তের সমাবেশ হয়।

শ্রীচৈতন্য যেদিন রামকেলি ছাড়িয়া বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগামী হইল। সনাতনও কিছুদূর তাঁহার সহিত চলিলেন এবং বিদায়কালে বলিলেন—

যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি॥

(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা)

মহাপ্রভু বুঝিলেন সনাতন মহাপ্রবীণের মতই কথা বলিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরে ফিরিলেন। মহাপ্রভু সনাতন ও রূপের ভক্তিপ্রীতি ও দৈন্যভাবে মুগ্ধ হইয়া উভয়কে ভক্তরূপে আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভুকে বিদায় দিয়া সনাতন ও রূপ নিবিষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন তাঁহাদের মন-প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন মানুষ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। উভয়ে যুক্তি করিয়া বিধর্মী রাজার অধীনে চাকরী ত্যাগ করা স্থির করিলেন। তাঁহারা দুইজন সুব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন এবং নিয়মিতভাবে জপানুশীলন করিতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চস্তরে উঠিতেছিলেন। চাকরী তাঁহাদের নিকট কখনও ভাল লাগে নাই। চৈতন্যদেবের কৃপা লাভের পর তাঁহারা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। ম্লেচ্ছাচার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে সাত্ত্বিক আচারাদি পালন করিতে লাগিলেন। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে এবং প্রাত্যহিক ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহারা নূতন মানুষ হইলেন। চাকুরীকে দাসত্ব মনে হইতে লাগিল। সনাতন কিছু ধীর, তিনি শান্তভাবে অবস্থা বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপ কিছু উগ্র ও চঞ্চল। চাকরী তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। শুনা যায়, এই সময়ে একদিন খুব বৃষ্টির ভিতর গুরুতর রাজকার্যে রূপ পালকীতে রাজদরবারে যাইতেছিলেন। এক ধোপা ও ধোপানী বৃষ্টির জন্য গৃহের বাহির হইতে পারে নাই। জলের ভিতর বাহকদের পদশব্দ শুনিয়া ধোপানী বলিল, "শৃগালের পদশব্দ।" ধোপা বলিল, "রাজবাড়ীর কোন চাকর, নতুবা ঐ বর্ষায় যাইবে কেন।" কথাগুলি শুনিয়া রূপের মনে চাকরীর প্রতি ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মিল। ম্লেচ্ছ রাজার দাসত্ব পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া রূপ

সেদিন গৃহে ফিরিলেন, আর চাকরী করিলেন না। উভয় ভ্রাতায় পরামর্শ হইল, দুইজনেই গৃহত্যাগ করিবেন, ইহাই স্থির হইল। তবে সনাতন বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বলিলেন, উভয়ে এক সময়ে কার্য ত্যাগ করিলে তাঁহাদের উপর ঘোর অত্যাচার হইতে পারে। সনাতনের পদ অতি উচ্চ এবং অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ; এজন্য স্থির হইল তিনি অগ্রে চাকরী ছাড়িবেন না। রূপ অগ্রে চাকরী ত্যাগ করিবেন। সংকল্প স্থির হইলে রূপের কার্যসিদ্ধিতে বিলম্ব সহ্য হয় না। রূপই ছিলেন সংসারের কর্ত্তা। অল্পদিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে দেনাপাওনা শোধ করিলেন, ধনসম্পত্তি গুছাইয়া লইলেন এবং তিনি ও সনাতন সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হইবে তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। অস্থাবর ধনসম্পত্তি যাহা পাইলেন সংগ্রহ করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া রামকেলির বাটী হইতে সমস্ত পরিবারকে নৌকাযোগে কতক চন্দ্রদ্বীপে ও কতক প্রেমভাগে পাঠাইলেন। সনাতনের আবশ্যক ব্যয়ের জন্য দশ হাজার টাকা গৌড়ে এক সম্পন্ন মুদির ঘরে গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। শ্রীরূপ বহুধন লইয়া প্রেমভাগে নিজগৃহে আসিয়াছিলেন। তথায় অর্দ্ধেক অর্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিলেন, বাকী যাহা রহিল তাহার অর্দ্ধেক আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। রাজসরকারের অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া অপরার্দ্ধ আকস্মিক বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। বল্লভ প্রথমে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলেন। তথায় যেসব আত্মীয় গিয়াছিলেন তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া পূর্বপরিকল্পিত মতে প্রেমভাগে শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরূপ জানিতেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। তিনি সনাতন ও রূপকে বনময় বৃন্দাবনের উদ্ধারের জন্য সেখানে যাইতে বলিয়াছিলেন। শ্রীরূপের ইচ্ছা মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইবেন তখন তিনি যাইবেন। মহাপ্রভু কোন্ সময় বৃন্দাবনে যাইবেন তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য গৌড় হইতে আসিবার পূর্বেই দুইজন লোক

নীলাচলে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা প্রেমভাগে আসিয়া সংবাদ দিল মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। বল্লভ প্রেমভাগে উপস্থিত হইলে উভয় ভ্রাতা ব্যস্ততার সহিত তথাকার ব্যবস্থা শেষ করিয়া চিরজীবনের মত গৃহত্যাগ করিলেন।

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের খাস মন্ত্রী বা সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ অমাত্য। বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধি সম্বন্ধে তিনিই পরামর্শদাতা। সুতরাং তাঁহারই কার্য্যভার গুরুতর—তজ্জন্য তিনি অগ্রে চাকরী ছাড়িলেন না।

রূপ চলিয়া গেলে সনাতনের নিকট পরের দাসত্ব আরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। রাজদরবারে অনিচ্ছায় যান, গেলেও বেশীক্ষণ থাকেন না। শেষে যাওয়াই বন্ধ করিলেন। বাদশাহ শুনিয়া সনাতনের কোন পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া প্রধান রাজ-কবিরাজ মুকুন্দ সেনকে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত ঠাকুর নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সনাতনকে দেখিয়া মুকুন্দ বাদশাহকে জানাইলেন সনাতনের কোন পীড়া হয় নাই। সনাতনের মত সুদক্ষ প্রবীণ রাষ্ট্রসচিব যদি রূপের মত কার্য ত্যাগ করেন, তাঁহার রাজ্য চলিবে কিরূপে? তিনি স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সনাতন সে সময়ে পণ্ডিতগণকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। সুলতানের অপ্রত্যাশিত আগমনে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যথোপযুক্ত ভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। হুসেন রাজকার্যে তাঁহার শৈথিল্যের কথা বলিয়া নানা অনুযোগ করিতে লাগিলেন, কত বুঝাইলেন, অবশেষে ভয় দেখাইলেন। সনাতন তাঁহার মনোভাব আর চাপিয়া রাখা অন্যায় ভাবিয়া বলিলেন "আমি কার্য ত্যাগ করিতেছি, আপনি অন্য লোক নিয়োগ করুন। বিষয়কর্মে লিপ্ত থাকিতে আমি আর পারিতেছি না।" হুসেন শাহ পুনরায় ওড়িষ্যা অভিযানে যাইবেন এবং সনাতনকে সঙ্গে লইবেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া স্বচক্ষে হিন্দুর দেবমন্দির ভগ্ন করার দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না।

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহ কহে যাবে তুমি দেবতা নাশিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)

ফল এই হইল, হুসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। সনাতন ভাবিলেন ইহাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। তিনি রাজাদেশ মাথা পাতিয়া লইলেন। বন্দীশালার কঠোর ক্লেশ তিনি নির্বাক হইয়া সহ্য করিতে লাগিলেন। এদিকে হুসেন ওড়িষ্যা অভিযানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন একদিন সনাতনকে কারাগার হইতে আনাইয়া পুনরায় বলিলেন "তুমি আমার সঙ্গে ওড়িষ্যায় চল"। সনাতন কিছুতেই রাজি হইলেন না। তখন তাহাকে পুনরায় কারাগারে পাঠাইয়া হুসেন শাহ ওড়িষ্যাবিজয়ে চলিয়া গেলেন।

শ্রীরূপ বৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে সংবাদ পাইলেন হুসেনশাহ সনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উপযুক্ত পাত্রকে দিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট এক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, গৌড়ে মুদির নিকট যে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে তাহা হইতে আবশ্যক মত টাকা লইয়া সনাতন যেন কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া আত্মবিমোচন করেন এবং বৃন্দাবনে আসেন। পত্র পাইয়া সনাতন কারাধ্যক্ষের নিকট অনেক কাকুতিমিনতি করিলেন। কারাধ্যক্ষ পূর্বে তাঁহার অনুগৃহীত হইলেও নবাবের ভয়ে প্রথমে রাজি হইল না। অবশেষে সাত হাজার টাকা যখন তাহার সম্মুখে রাখা হইল, তাহার লোভে কারাধ্যক্ষ সনাতনকে ছাড়িয়া দিল, এমনকি গঙ্গা পার করিয়া দিল। এই কারাধ্যক্ষের নাম ছিল সেখ হবু। গৌড়ের একাংশে সেখ হবুর বাটী ও সনাতনের কারাগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান।

মুক্ত হইয়া সনাতন দরবেশের ছদ্মবেশ ধরিয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। নবাবের রাজ্য মধ্যে ধরা পড়িলে তাঁহার পুনরায় কারাবাসের সম্ভাবনা। সেইজন্য তিনি রাত্রিকালে বনপথে ভাগীরথী

পার হইয়া উত্তর-পশ্চিমমুখে চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ ও বৃন্দাবন যাওয়া। সঙ্গে ঈশান নামক তাঁহার এক অনুরক্ত ভৃত্য। প্রভুর সেবার দরকার হইতে পারে মনে করিয়া ঈশান গোপনে আটটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। কয়েকদিন পর এক পর্বতের পাদদেশে সনাতন এক ভূঞ্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভূঞ্যার অনুচরগণ অর্থের জন্য ডাকাতি ও নরহত্যা করিত। ভূঞ্যার অনুচরগণ কোনরকমে জানিতে পারিল যে ঈশানের নিকট স্বর্ণমুদ্রা আছে। অত্যন্ত আদরযত্নে সনাতনের সন্দেহ হয়। ঈশানের কাছে অর্থ আছে কিনা অনুসন্ধান করায় ঈশান বলিল "সাতটী স্বর্ণমুদ্রা আছে।" সনাতন তৎক্ষণাৎ উহা লইয়া ভূঞ্যাকে দিলেন। ভূঞ্যা রাত্রিকালে পাইক সঙ্গে দিয়া সনাতনকে নির্বিঘ্নে বনাকীর্ণ পর্বত পার করিয়া দিল। পর্বত পার হইয়া সনাতন ঈশানের নিকট আর কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান স্বীকার করিল আর একটী মোহর আছে। ইহা শুনিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ঈশান, উহাই তোমার পথের সম্বল। তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, আমি একাকী যাইব, সঙ্গীর আবশ্যক নাই।" অশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়া ঈশান প্রভুকে প্রণাম করিয়া দেশের দিকে যাত্রা করিল।

হাতে একটী জলপাত্র এবং পরিধানে একখানি ছিন্ন বস্ত্র। এই ভাবে সনাতন একলা চলিলেন। ক্রমে হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত নিকটবর্তী শোণপুরের মেলা হইতে নবাবের অশ্ব ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকান্ত সনাতনকে দরবেশের কাপড় ছাড়িয়া ভদ্রবেশ ধারণ করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। সনাতন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে শীত নিবারণের জন্য একখানি ভুটানি কম্বল শ্রীকান্তের কাছ থেকে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লইতে বাধ্য হইলেন। আবার পথ চলিতে চলিতে কিছুদিন পর সনাতন কাশীধামে উপনীত হইলেন।

পৌঁছিয়াই সনাতন শুনিলেন, মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে কাশীতে আসিয়াছেন। প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে আছেন

শুনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন। মহাপ্রভু দ্বারস্থ বৈষ্ণবকে ডাকিয়া আনিতে চন্দ্রশেখরকে বলিলেন। তিনি দ্বারে কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে না পাইয়া প্রভুকে বলিলেন "একজন দরবেশ বসিয়া আছে, কোন বৈষ্ণব নাই।" প্রভু সেই দরবেশকেই আনিতে আদেশ করিলেন। বাটীর ভিতরের প্রাঙ্গনে সনাতন উপস্থিত হইবামাত্র প্রভু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলে অবাক হইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল। সনাতন বারংবার বলিতেছেন, "প্রভু, আমাকে ছুঁইও না, আমি অস্পৃশ্য।" ইহা শুনিয়া—

"প্রভু কহেন তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভু সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রকারে নবাবের কারাগার হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। সনাতন আদ্যোপান্ত সবকথা তাঁহাকে শুনাইল। সনাতন প্রভুর নিকট সংবাদ পাইল রূপ ও বল্লভের সহিত প্রয়াগে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বল্লভের নাম প্রভু অনুপম করিয়াছেন। উভয়ে বৃন্দাবন গিয়াছে। প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে ক্ষৌর করাইলেন, স্নানান্তে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু সনাতন উহা গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন "যদি একান্তই দিতে হয় একখানি পুরাতন বস্ত্র দাও।" সনাতন পুরাতন বস্ত্র পাইয়া ছিঁড়িয়া দুইখানি বহির্বাস ও কৌপীন করিয়া লইলেন। তারপর মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণের জন্য তপন মিশ্রের বাড়ী গেলেন।

এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সনাতনকে প্রত্যহ তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন জানাইলেন, তিনি পাঁচ বাড়ীতে মাধুকরী করিবেন, একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভিক্ষা করিবেন না। ইতিমধ্যে সনাতন লক্ষ্য করিলেন মহাপ্রভু বার-বার তাঁহার গায়ের মূল্যবান ভোট কম্বলের প্রতি চাহিতেছেন। সনাতন ইহার অর্থ বুঝিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখেন এক গৌড়ীয় সন্ন্যাসী নিজ কান্থা শুকাইতে দিয়া বসিয়া আছেন। সনাতন কাতর

কণ্ঠে ভোটকম্বলখানির পরিবর্ত্তে ঐ কান্থাখানি চাহিলেন। সাধুটী ত অবাক্। সনাতন যখন তাহাকে বুঝাইলেন তিনি রহস্য করিতেছেন না—সত্যসত্যই ভোট কম্বলের পরিবর্ত্তে কান্থাখানি চাহিতেছেন, তখন সাধুটী রাজি হইলেন। ঐ কান্থাখানি গায়ে দিয়া তিনি প্রভুর কাছে আসিলেন। প্রভু দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "সনাতন, এইবার শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বিষয়রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিলেন।" বাস্তবিকই আজ সনাতন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দীনাতিদীন বৈরাগী। নবাবের মন্ত্রী রূপে তিনি যাহা করিয়াছেন বা তাঁহার প্রভাবে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সব স্মরণ করিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য অবশ্য জানিতেন অতিশয় দৈন্য প্রকাশ সত্ত্বেও তিনি তত্ত্বজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তবুও সনাতন অকপট চিত্তে সকল সন্দেহ বিদূরিত করিবার জন্য যে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন, প্রভু একে একে তাহাদের উত্তর দিয়া সকল দার্শনিক তত্ত্বের সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়া দিলেন। উহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সারতত্ত্ব নিহিত। ইহাই 'সনাতন শিক্ষা' নামে প্রচলিত। এই শিক্ষা লাভের জন্য সনাতন কাশীতে দুইমাসের অধিক কাল কাটাইলেন। এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের জীবনী রচনা—দার্শনিক তত্ত্ব বা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা নহে। তবুও এই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা) আছে। সনাতন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কে আমি আমারে কেন জারে তাপ ত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥

মহাপ্রভু বলিতেছেন—

যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

মহাপ্রভুর উপদেশগুলির সারমর্ম—কৃষ্ণের ভক্তি। (চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণ ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি সুখ-নিরীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥

*　　*　　*

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ যার॥
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
স্বধর্ম শিক্ষা স্পৃহা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥

সনাতন একদিন মহাপ্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, আমি শুনিয়াছি তুমি একটী শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা সার্বভৌমকে শুনাইয়াছিলে। যদি সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমাকে শুনাও, কৃতার্থ হইব। শ্লোকটী এই—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥'

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন 'সনাতন, আমি এক পাগল, সার্বভৌম আর এক পাগল। এক পাগল আর এক পাগলকে কি বলিল সে তাহা বিশ্বাস করিল। তবে তুমি কৃষ্ণভক্ত, তোমার সঙ্গ হেতু আমার মুখ দিয়া যদি ইহার কিছু অর্থ বাহির হয়, বলিতেছি শুন।' এই বলিয়া মহাপ্রভু পুনরায় ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং এক দুই করিয়া এক ষষ্টি রকম ব্যাখ্যা সনাতনকে শুনাইলেন।

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥

সনাতনকে প্রভু আরও বলিলেন, 'শাস্ত্রজ্ঞান ও গুরুকৃপা দ্বারা সাধন ভজনের উপদেশ পাওয়া যায়। সাধনভজন হইতে প্রেম-ভক্তি জন্মে। ভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। তাঁহাকে পাইলেই সব পাওয়া হয়।' ইহার পর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী সনাতন কত প্রসঙ্গে কত প্রশ্ন করিলেন। প্রভু সনাতনকে কৃষ্ণ অবতারের বিশেষত্ব ও পূর্ণত্ব বুঝাইয়া দিলেন, বৃন্দাবন লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, ভক্তের লক্ষণ, প্রেমের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ক নানা অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত শিখাইলেন। প্রভু যে শিক্ষা দিলেন, তাহা সনাতনের অন্তরে যাহাতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় এজন্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিলেন।

এইভাবে দুই মাস মহাপ্রভু সনাতনকে নানাভাবে ভক্তিতত্ত্ব শিখাইলেন। অতঃপর নীলাচলে চলিলেন। যাইবার কালে সনাতনকে বলিলেন 'সনাতন, তুমি এবার বৃন্দাবন যাও। রূপ ও অনুপম (বল্লভ) ইতিমধ্যে সেখানে গিয়াছে। আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গেলে তুমি তাদের দেখিও।'

এই ঘটনার কিছুপূর্বে শ্রীরূপ অনুজ বল্লভের সহিত গৌরাঙ্গের চরণ লাভের আশায় প্রেমভাগ হইতে পদব্রজে চলিয়াছেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। পথে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। পথে তিনি শুনিতে পাইলেন হুসেন শাহের কোপে পড়িয়া সনাতন কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। এক বিশ্বস্ত গৌড়ীয় ভৃত্য দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিয়া সনাতনকে জানাইলেন গৌড়ে এক মুদির নিকট দশহাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন। সনাতন যেন ঐ টাকা হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ উৎকোচ দিয়া মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে যান। ইহার পর সনাতন কিরূপে কারামুক্ত হইয়া কাশীধামে পৌঁছিয়াছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিছুদিনের মধ্যে রূপ ও বল্লভ প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তথায় আসিয়াছেন। তিনি যখন বিন্দুমাধব দর্শনে

গেলেন অসংখ্য লোক তাঁহার সঙ্গে চলিল। রূপ ও বল্লভ সেই সঙ্গে চলিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া যখন শ্রীচৈতন্যদেব এক পূর্ব-পরিচিত দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন তখন শ্রীরূপ ও বল্লভ উভয়ে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়কে নিকটে বসাইয়া প্রভু সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন সনাতন শীঘ্রই মুক্ত হইয়া আসিবেন। গৃহস্বামী দুই ভাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা তথায় আসিয়া প্রসাদ পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। ত্রিবেণীর উপর প্রভুর বাসঘরের সন্নিধানে দুইভাই বাসা করিলেন। তৎপর লোকভিড় ভয়ে প্রভু ত্রিবেণীতে এক নির্জন গৃহে অবস্থিতি করিলেন। তথায় দশদিন থাকিয়া তিনি রূপকে প্রেমধর্মের নিগূঢ় স্বরূপ শিক্ষা দিলেন।

এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥

* * *

ধর্মচারি মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

(চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)

প্রভু রূপকে বলিতেছেন "যখন কেহ অন্য বাঞ্ছা ছাড়িয়া অনন্যচিত্ত হইয়া অন্য দেবতার পূজা ছাড়িয়া জ্ঞান-কর্ম সব পরিত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয় দিয়া কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসেবা করেন তখন তাহাকেই বলে শুদ্ধাভক্তি। সাধনের ক্রম অনুসারে ভক্তি আট প্রকার; ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব। আবার ভক্তের

বিভিন্ন ভাবানুসারে কৃষ্ণভক্তিরস পাঁচ প্রকার, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। সনক-সনাতনাদি শান্তভক্ত, মহাবীরাদি দাস্য-ভক্ত, ভীমার্জ্জুন ও শ্রীদামাদি সখ্যভক্ত, নন্দযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভক্ত এবং ব্রজগোপীগণ মধুররস ভক্তের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মহাপ্রভু বলিলেন "রূপ, আমি ভক্তিরসের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম, তুমি ইহার বিস্তার মনে মনে ভাবনা করিও। ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃকরণে কৃষ্ণের স্ফুরণ হয় এবং কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও রসসিন্ধুপারে যায়।"

অতঃপর প্রভু বারাণসী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রূপ তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—

প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলে আসিয়া॥

এই বলিয়া প্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া নিজে বারাণসী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রূপ তদবধি তদ্গতচিত্ত হইয়া এই ভক্তিরসের তত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর এই তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠ সনাতনের সহযোগে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" রচনা করেন। কিন্তু সেই বিরাট গ্রন্থেও পঞ্চম অর্থাৎ মধুর রসের বিশেষ বিস্তার হয় নাই বলিয়া পরে "উজ্জ্বলনীলমণি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখেন।

প্রয়াগে মহাপ্রভু রূপের সহিত ভক্তিরসের প্রাথমিক আলোচনা করিয়া উহার সম্বন্ধে বিস্তৃত চিন্তা করিতে বলিয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রূপকে বৃন্দাবনে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত নীলাচলে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। বৃন্দাবনের পথে মথুরায় ধ্রুব ঘাটে রূপ ও অনুপমের সহিত সুবুদ্ধি রায়ের দেখা হয়। তিনি গৌড়ের একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ভূম্যধিকারী ছিলেন। হুসেন শাহ গৌড়ের নবাব হইবার বহুপূর্বে যখন ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আসেন

তখন সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। একটি দীঘি খনন কার্যে কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহাকে চাবুক মারা হয়। পরবর্ত্তীকালে হুসেন নবাব হইলে তাহার স্ত্রী ক্ষতের কারণ অবগত হইয়া সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করিতে বলে। হুসেন পূর্ব প্রভুর প্রাণ লইতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁহার মুখে "করোয়ার পানী" দিয়া তাহার জাতি নাশ করা হইল। সুবুদ্ধি রায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাশীতে গেলেন এবং পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে বলিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার পথে কাশীতে ছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি রায়কে বলিলেন, "সেরূপ কিছু করিতে হইবে না। তুমি বৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, তাহাতেই তোমার পাপ যাইবে।" তিনি মথুরায় আসিয়া দীন-হীন কাঙ্গালের মত বাস করিতে লাগিলেন; তিনি দিবারাত্র কৃষ্ণনাম করিতেন, বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া পাঁচ ছয় পয়সায় বিক্রয় করিয়া এক পয়সার ছোলা চিবাইয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং বাকী পয়সা এক বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। গৌড় হইতে কখনও কোন ভক্ত আসিলে ঐ অর্থ দ্বারা তাহার যথাসাধ্য আপ্যায়ন করিতেন।

মথুরায় রূপকে পাইয়া সুবুদ্ধি আনন্দে গলিয়া গেলেন, তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে দ্বাদশ বন দেখাইলেন। রূপ ছিলেন কবি ও ভাবুক। মহাপ্রভু যখন শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শুদ্ধা ভক্তির সারতত্ত্ব মধুর রসের প্রকৃতি তাঁহাকে শিখাইলেন, তখন হইতে তিনি এক প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিতেছিলেন। মনের ভিতর ভাবের আগুন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। এদিকে প্রাণসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারাগারে, মুক্তি পাইয়া তখন পর্যন্ত বৃন্দাবনে আসেন নাই, এই চিন্তায় রূপ এক মাসের অধিক কাল বৃন্দাবনে তিষ্ঠিতে পারিলেন না— সনাতনের সন্ধানে বাহির হইলেন। কাশীতে আসিয়া সংবাদ পাইলেন, সনাতন মুক্তিলাভ করিয়া কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন তারপর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সনাতন মুক্ত হইয়াছেন জানিয়া

রূপ আনন্দিত হইলেন কিন্তু অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় ব্যথিত হইলেন। প্রভুর আজ্ঞা—নীলাচলে যাইতে হইবে—স্মরণ হইল। অপর পক্ষে অনুপমের একবার গৌড়ে যাইবার প্রয়োজন ছিল। সনাতনের গৌড় ত্যাগ করিবার পর বিষয়াদির শেষ ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহাও চিন্তা করিলেন। উভয় ভ্রাতাই গৌড়ে গেলেন। তথায় অকস্মাৎ কয়েকদিনের অসুস্থতায় অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। শোকে রূপ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, চৈতন্যগতপ্রাণ। সকল শোক সম্বরণ করিয়া বিষয়বিত্তের কতক দান করিলেন, কতক বিক্রয় করিয়া ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্যয় করিলেন। কতক পরিজনবর্গের ভরণপোষণের জন্য বাক্‌লার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব দেশত্যাগ করিলেন, আর কখনও ফিরিয়া আসেন নাই। এই সময়ে অনুপমের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব অল্পবয়স্ক বালক। শ্রীজীব পরিজনসহ বাক্‌লার বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

রূপ পদব্রজে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া হরিদাসের নিভৃত ভজনকুটীরে উপস্থিত হইলেন। রূপের আসিবার কথা হরিদাস প্রভুর মুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। পরমানন্দে রূপ ও হরিদাস সে রাত্রি যাপন করিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমন্দিরে উপলভোগের পর হরিদাসের কুটীরে আসিতেন। পরদিন প্রাতে আসিবামাত্র রূপ গিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন।

তখনও রথযাত্রার কয়েকদিন বাকী ছিল। বহু গৌড়ীয় ভক্ত এই উপলক্ষে এবার শ্রীধামে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দও ছিলেন। পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের কুটীরে মিলিত হইলেন। তিনি বারংবার শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলে রূপকে আশীর্বাদ করুন। সেই শক্তির বলে ইনি যেন কৃষ্ণভক্তিরস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ রচনা করিতে পারেন।" এইভাবে দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটিতে লাগিল। ক্রমে রূপের কবিত্বের আভাস সকলে পাইলেন।

তাঁহার মধুর চরিত্র, বিনীত প্রকৃতি এবং দিব্যমূর্ত্তির প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যে প্রভুর গৌড়ীয় ও ওড়িষ্যাবাসী ভক্ত রূপকে পরম স্নেহভাজন করিয়া লইলেন। রূপ হরিহাস ও সনাতনের মত আপনাকে ম্লেচ্ছাধম বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য কখনও শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। দূর হইতে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিতেন। মহাপ্রভুর ব্যবস্থায় প্রত্যহ উভয়ের জন্য শ্রীমন্দির হইতে প্রসাদ আসিত। হরিদাসের কুটীরে হরিদাস ইষ্টমন্ত্র জপে নিরত থাকিতেন আর রূপ শাস্ত্র আলোচনা ও গ্রন্থ রচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

ক্রমে রথ-যাত্রার সময় আসিল। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া রূপ আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। রথের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু রূপকে যাইতে দিলেন না, তাঁহাকে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকিতে বলিলেন। রূপকে নীলাচলে আসিতে বলার সম্ভবতঃ একটা উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর ছিল—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই রূপকে ঐ সময় নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইতে দিলেন না।

রূপের কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। তিনি আজন্ম সুকবি। একাধারে এমন কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি বিরল। গৌড়ে রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার এই সব গুণ প্রকাশে বাধা হইত না। গৌড়ে থাকিতেই তিনি 'হংসদূত' ও 'উদ্ধব-সন্দেশ' নামক কাব্য রচনা করেন। উহা পরে বৃন্দাবনে শেষ হইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিবার পর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলা একটি মাত্র নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা একখণ্ডে এবং পরবর্ত্তী লীলা পৃথক একখণ্ডে লিখিত হয়। ব্রজলীলা বিষয়ক নাটকের নাম হয় "বিদগ্ধমাধব" এবং অপর নাটকখানার নাম হয় "ললিত মাধব"। হরিদাসের কুটীরে এবং মহাপ্রভুর সঙ্গগুণে রূপের স্বাভাবিক কবিত্ব-প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফূরিত হইয়াছিল।

নীলাচলে রচনার ফলে নাটক দুইখানি সর্ববিধ দোষ বিবর্জিত

হইয়া আদর্শস্থানীয় হইবার সুযোগ পাইল। কারণ মহাপ্রভুর দুই অন্তরঙ্গ ভক্ত রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর উভয়ে তাঁহার নাটকদ্বয়ের গুণ পরীক্ষা করিয়া নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগরের রাজা রায় রামানন্দ পরম ধার্মিক ও অনন্যসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে শ্রীচৈতন্যের রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয়। গৌরাঙ্গপ্রেমে বিভোর হইয়া রায় রামানন্দ নীলাচলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ রস-মাধুর্য-তত্ত্বের অতীব অধীয়ান এবং ভক্তি সাধন মার্গে উচ্চতম অধিকারী। রসতত্ত্ব শাস্ত্রে তিনি রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গেরও উপদেষ্টা।

স্বরূপ দামোদর সন্ন্যাসের পূর্বে নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রায় সমবয়স্ক এবং শাস্ত্রপারদর্শী পরম পণ্ডিত ছিলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরে তিনি কাশীতে গিয়া এক সন্ন্যাসী গুরুর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লন। তখন তাঁহার নাম হয় স্বরূপ দামোদর। তিনি কাশী হইতে নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং ক্রমে একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হন। তিনি সুমধুর সুরে গান করিতে পারিতেন। শাস্ত্রেও তিনি "বৃহস্পতি"। সর্বদা ছায়ার মত প্রভুর পার্শ্বে থাকিতেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর ও সূক্ষ্ম সমালোচক। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন রচনা প্রভুর মনঃপূত হইত না। রূপ প্রভুর বড় প্রিয় পাত্র। প্রভুর ইচ্ছা রূপকে দিয়া ভক্তিরসশাস্ত্র লেখাইবেন। রূপের রচনা তাঁহার ভাল লাগিলেও স্বরূপ ভাল বলেন কিনা তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল।

একদিন দৈবক্রমে সন্দেহের মীমাংসা হইল। প্রভু "কাব্য প্রকাশে"র একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া রথাগ্রে নৃত্য করিলেন। স্বরূপ একটি গানে উহার ভাব সংক্ষেপে প্রকটিত করেন, অন্য কেহ প্রকৃত মর্ম বুঝেন নাই। একদিন প্রভু দেখিলেন হরিদাসের কুটীরের চালে রূপ ঠিক ঐ মর্মের একটি সুন্দর রচনা তালপত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

রূপ কিরূপে তাঁহার মনের ভাব জানিয়া ঐ লেখায় প্রকাশ করিলেন ইহা ভাবিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন।

তাহার পর একদিন প্রভু রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ এই দুই রস-শাস্ত্রজ্ঞ সমালোচক সঙ্গে লইয়া রূপের নাটক পরীক্ষা করিলেন। তিনি নিজেই রূপের খাতা-পত্র টানিয়া স্থানে স্থানে পড়িতে লাগিলেন। রূপের হস্তাক্ষর ছিল অতীব সুন্দর। তিনি হস্তাক্ষর সম্বন্ধে বলিতেন "শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুক্তার পাঁতি।" কবিতাগুলির সর্বাঙ্গে অপূর্ব কবিত্ব এবং ছন্দের লালিত্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। মহাপ্রভু বিদগ্ধমাধবের পাণ্ডুলিপি হইতে এক একটি শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। স্বরূপ রামানন্দের নিকট রূপের নাটক রচনার কথা বুঝাইয়া দিলেন। রায় তখন একে একে নাটকের লক্ষণানুযায়ী নানা স্থান হইতে নানা প্রসঙ্গের শ্লোক পাঠ করিতে রূপকে বলিলেন। রূপ সলজ্জভাবে একে একে রামানন্দের ফরমাইজ মত নানাস্থান হইতে শ্লোকগুলি পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। সে শ্লোকগুলি এত মধুর, নাটকের ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এমন ভাবে লিখিত এবং এমনভাবে সিদ্ধান্তবিরোধশূন্য যে, শুনিয়া মহাপ্রভুর ত কথাই নাই, দুই কঠোর সমালোচক রায় রামানন্দ ও স্বরূপ উভয়েই অবাক্ হইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয় নাটকের অসংখ্য শ্লোক পঠিত, ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হইল। সকলের মুখে এক কথা—সে শুধু প্রশংসার কথা। গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় নাটকীয় লক্ষণাবলী অনুসারে বিচার করিলে আদর্শ নাটক এবং প্রেমভক্তিরসের সিন্ধুস্বরূপ। রামানন্দ শত মুখে রূপের কবিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার মত সূক্ষ্মরসতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া বোধহয় অন্যে লিখিতে পারিবে না। আজ তিনি বুঝিলেন ক্ষমতা তাঁহার নহে, রূপেরও নহে, শক্তি সকলই ঈশ্বররূপী শ্রীগৌরাঙ্গের। রূপের লেখনী সার্থক হইয়াছিল। তিনি মোট দশ মাস নীলাচলে থাকার পর বৃন্দাবনে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন।

প্রভু বলিয়া দিলেন,

'ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার ॥

(চ. চ. অন্ত্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ)

প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া আর হয় নাই।

মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে সনাতন কাশী হইতে রাজপথ দিয়া বৃন্দাবন চলিলেন। বেশ পাগলের মত। তিনি আত্মহারা ভক্তের প্রেমাবেশে বৃন্দাবনে আসিলেন এবং "আদিত্য টিলা" নামক পাহাড়ে এখন যেখানে ৺মদনমোহনজীর পুরাতন ভগ্ন মন্দির সেই স্থানে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ, কোন গৃহস্থ বা সাধুসজ্জনের বাস ছিল না। সুবুদ্ধি রায়ের সহিত সনাতনের দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার আদরযত্ন ভাল লাগিল না। তিনি সংসারে মহাবিরক্ত, সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য। তিনি রাত্রিদিন বৃক্ষতলে বাস করিতেন। বৃন্দাবনে ভিক্ষার স্থান ছিল না। এই জন্য প্রত্যহ হাঁটিয়া মথুরায় যাতায়াত করিতেন। তথায় দুই চারি গৃহস্থ-গৃহে মাধুকরী করিয়া যাহা পাইতেন তদ্দারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেন এবং লুপ্ত তীর্থের সন্ধানে বনে-বনে ভ্রমণ করিতেন। মথুরার প্রাচীন মাহাত্ম্য যাহাতে কীর্ত্তিত এমন সব প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার সাহায্যে কোন কোন তীর্থ আবিষ্কার করিলেন। লোকনাথ পূর্ব হইতেই এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবার সনাতন তাঁহার সহযোগী হইলেন এবং শাস্ত্রের বিচার করিয়া তীর্থগুলির প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হইলেন।

এইভাবে এক বৎসর গেল। এই কার্য পরেও বহু বৎসর চলিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরের পর সনাতনের মন উচাটন হইয়া উঠিল। রূপ-অনুপমের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। একবার নীলাচলে যাইবার জন্য তাঁহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। সুতরাং

সনাতন বড় উদ্বিগ্ন মনে প্রভুর সহিত সাক্ষাতের জন্য নীলাচল অভিমুখে চলিলেন।

তিনি প্রথমতঃ রাজপথ দিয়া আসিয়া ঝাড়িখণ্ডের (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার) মধ্য দিয়া একাকী ওড়িষ্যায় যাইতেছিলেন। পথে যে কত কষ্ট হইল তাহা বলিবার নহে। কভু উপবাস, কভু ছোলা প্রভৃতি কিছু চর্বণ করিয়া জল পান করতঃ জ্বালা নিবারণ করিতেন। সে জলও পানের উপযোগী ছিল না। দেহের প্রতি কোন দৃষ্টি না রাখিয়া আহার ও পানের গুরুতর অনিয়মে তাঁহার দেহের সর্বত্র চুলকণা দেখা দিল। চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষত হইয়া তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইত। সনাতন ভাবিলেন "আমি আচারভ্রষ্ট হইয়া নীচ জাতি হইয়া গিয়াছি। না হইলে শরীরে কি এইরূপ কুষ্ঠরোগ হয়? নীলাচলে এই দেহ লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে বা মহাপ্রভুর পদস্পর্শনে কিছুতেই আমার অধিকার নাই। আমার মত মহাপাতকীর মরণই শ্রেয়ঃ। অতএব পুরীধামে রথোৎসবের সময় শ্রীজগন্নাথের রথচক্রের নীচে পড়িয়া এই দেহ বিসর্জন দিব।"

এইরূপ সংকল্প লইয়া সনাতন নীলাচলে আসিলেন কিন্তু শ্রীমন্দিরে গেলেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হরিদাসের কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ উহার ৮।১০ দিন পূর্বে নীলাচল হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হরিদাস নিজেকে ম্লেচ্ছাধম বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও স্পর্শ-সীমায় না আসিয়া দূরে দূরে থাকিতেন। সনাতনও সেইভাবে থাকিবার জন্য হরিদাসের কাছে আসিলেন। পরিচয় পাওয়া মাত্র হরিদাস উঠিয়া আসিয়া সনাতনকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। দুইটী ভক্তহৃদয়ের কি অপূর্ব মিলন হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের একটী নিত্যক্রিয়া ছিল, প্রত্যহ হরিদাসকে দর্শন দেওয়া। তিনি প্রাতে ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া উপলভোগের পর সর্বাগ্রে হরিদাসের কুটীরে আসিতেন এবং সেখান হইতে সমুদ্রস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতেন। সনাতন আসার পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু

আসিলে হরিদাস ও সনাতন উভয়ে গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে গেলে সনাতন ব্যস্ত হইয়া জোড়হস্তে বলিলেন, "আমি তোমার পায়ে পড়ি প্রভু, আমাকে ছুঁইও না। একে আমি নীচ জাতি, তাহাতে আমার গায়ে কণ্ডুরস।" কিন্তু প্রভু কি তাহা শুনেন? তিনি ধাইয়া গিয়া জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন মনঃক্ষোভে মরিয়া গেলেন।

প্রভু তাঁহাকে মথুরার বৈষ্ণব ভক্তদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আর বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন, কয়েকদিন মাত্র হইল চলিয়া গিয়াছেন। রামকেলিতে গঙ্গাতীরে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। ভক্তের দিব্যগতি হইয়াছে তাহা শোকের বিষয় নহে।" এই বলিয়া বল্লভের (অনুপমের) অপূর্ব রঘুনাথভক্তির কথা ও বিবিধ গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। সনাতন এই প্রথম কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুর খবর শুনিলেন কিন্তু বিচলিত হইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতনকে হরিদাসের কুটীরেই থাকিতে বলিলেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিত। মহাপ্রভু প্রত্যহ আসিতেন কিন্তু সনাতনের মনঃকষ্ট যায় না। তাঁহার গায়ের ঘা শুকায় নাই। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিলে তাঁহার গায়ের ক্লেদ মহাপ্রভুর গায়ে লাগিত ইহাতেই তাঁহার অসহ্য চিত্তগ্লানি হইত। ভাবিলেন রথযাত্রার দিন রথের নিম্নে পড়িয়া তাঁহার পাপ-দেহের অবসান করিবেন।

তাঁহার এই পাপ-সঙ্কল্পের কথা মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া সনাতনকে যাহা বলিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—

একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥

* * *

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥

প্রভু কহিলেন, "সনাতন আমি তোমা দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিব, বৈষ্ণব আচরণ ও বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় কর্মের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করাইব, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার তোমা দ্বারাই হইবে। এত কার্য যে দেহ দ্বারা করিব, তাহা তুমি নষ্ট করিতে পার না।"

সনাতন কাষ্ঠপুতুলের মত স্থির হইয়া প্রভুর আজ্ঞা শুনিলেন। এই দিন হইতে মরণসংকল্প ত্যাগ করিয়া ভজনানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন গৌরাঙ্গ আসিয়া আলিঙ্গন করেন। এইভাবে সেই সোনার অঙ্গের সঙ্গগুণে, সেই পরশমণিস্পর্শে সনাতনের দেহের ঘাগুলি সারিয়া গেল। ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন—ইহার পর সনাতনের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ বাহির হইত।

ক্রমে রথযাত্রা আসিল। গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিলেন, চারিমাস নীলাচলে রহিলেন। সনাতনও ক্রমে তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ চলিয়া গেলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। দোলযাত্রা পর্যন্ত সনাতনকে নীলাচলে রাখিয়া, বৃন্দাবনে তাঁহার কি করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিলেন। অবশেষে প্রভু যে বনপথে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন সেই পথের সমস্ত বার্ত্তা বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছে লিখিয়া লইয়া সেই পথ দিয়া সনাতন বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। আর তিনি কখনও এই শ্রীধাম পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্বের মত আদিত্যটিলায় বাস করিতে লাগিলেন। এইবার বহুকাল

পরে উভয় ভ্রাতার শ্রীবৃন্দাবনে মিলন হইল। উভয়ে কঠোরসাধনা ও শাস্ত্র আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া শীঘ্রই ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে যেমন দীনমূর্ত্তির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদে তাঁহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে তাঁহাদিগকে লোকে মানবরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহাদের দর্শন করিলে জীবন চরিতার্থ হইবে মনে করিয়া তাঁহাদের কুটীরের সম্মুখে ভক্তগণ আসিয়া নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত। তাঁহাদের ভজনকুঞ্জ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। সনাতন ও রূপের ভজন-সাধনে সময় অতিবাহিত হইলেও মহাপ্রভুর আদেশ তাঁহাদের স্মরণ ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি তাঁহাদের বাহির করিতে হইবে, প্রাচীন বিগ্রহগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বনাকীর্ণ বৃন্দাবনে ভিক্ষার স্থান ছিল না। মাধুকরীর জন্য সনাতনকে মথুরায় যাইতে হইত। এই স্থানে দামোদর চোবে নামক (কাহারও মতে পরশুরাম চতুর্বেদী) এক ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি শ্রীশ্রীমদনগোপাল নামে এক নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পান। সেই বিগ্রহ তাঁহার মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল। মথুরায় প্রায় প্রত্যহ আসিতে হইত এবং মাধুকরীর পর একবার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তবে বৃন্দাবনে ফিরিতেন। ক্রমে তিনি বিগ্রহের প্রতি এত আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সজল নয়নে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। দামোদর (বা পরশুরাম) তখন জীবিত ছিলেন না। কথিত আছে, তাঁহার পত্নী একদিন স্বপ্নাদেশ পাইলেন, বিগ্রহকে সেবার জন্য সনাতনকে দান করিতে। সনাতন কৃতার্থ হইয়া মহানন্দে ঠাকুর লইয়া নিজের কুটীরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঈশান নাগরকৃত "অদ্বৈত প্রকাশে"র মতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আদিত্যটিলায় সেই বিগ্রহ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন এবং প্রত্যাগমন কালে উহার সেবাভার

মথুরার এক চোবে বা চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের করে ন্যস্ত করেন। সনাতন সেই চোবের গৃহ হইতেই মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। এই মদনগোপাল অতি প্রাচীন বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে যে অষ্টমূর্ত্তির আবিষ্কার করেন শ্রীমদনগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। ১৫৩৪ খ্রীঃ মাঘ মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সনাতন ৺মদনগোপালের সেবারম্ভ করেন। উহার ৭/৮ মাস পূর্বে আষাঢ়ী শুক্লা নবমীতে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অপ্রকট হন। সুতরাং তিনি শুধু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশই দিয়া গিয়াছিলেন।

সনাতন বৃন্দাবনে একটী উচ্চ স্তূপের উপর ঝুপরী বাঁধিয়া ঠাকুরকে স্থাপন করিলেন। দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সামান্য আটা পাইতেন, তাহাই জলে মাখিয়া গোল গোল করিয়া পাকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া রুটী করিতেন এবং বন্য শাক আনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ রুটীর সহিত বিনা লবণে ভোগ দিতেন। ঠাকুর স্বপ্নে জানাইলেন অলবণভোগে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। সনাতন কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিনরাত্রি মনের দুঃখে কাঁদিতেন আর ঠাকুরকে বলিতেন "ঠাকুর, তুমি রাজরাজেশ্বর! রাজভোগ ভিন্ন তোমার তৃপ্তি হয় না সত্য। কিন্তু আমার মত কাঙাল রাজভোগ কোথায় পাইবে। আমার নয়নজলে তোমাকে স্নান করাই, সামান্য ভক্তি যদি কিছু থাকে তাহাই চন্দন করিয়া তোমাকে চর্চিত করি, ভিক্ষায় যাহা পাই তাহা দ্বারাই তোমার ভোগের ব্যবস্থা করি। তোমার যদি ইহাতে তৃপ্তি না হয়, তুমি তোমার নিজের রাজভোগের ব্যবস্থা নিজেই কর।" ইহা বলিতেন, কাঁদিতেন তারপর তদ্গতচিত্তে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

ইহার পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। লালা রামদাস কর্পূর নামে এক ধনী বণিক পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতান নগরে বাস করিতেন। ভারতবর্ষের বহু নগরীতে তাঁহার ব্যবসা চলিত। একদা বহুবিধ পণ্য-ভারাক্রান্ত কয়েকখানি তরণী লইয়া যমুনা পথে মথুরায় আসিতে-ছিলেন। বৃন্দাবনের নিকট আসিয়া সনাতনের কুটীরের সম্মুখে সূর্যঘাটের নিকট তাঁহার পণ্যবাহী তরণীগুলি অকস্মাৎ চড়ায় ঠেকিয়া

অচল হইল। রামদাস বহু চেষ্টায় নৌকাগুলি উদ্ধার করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিকটে জঙ্গলের ভিতর কোথাও লোকের বসতি দেখা গেল না।

অবশেষে সন্ধ্যাকালে দেখিলেন নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর এক কুটীরে মিটিমিটি দীপ জ্বলিতেছে। অনন্যোপায় বণিক সেখানে গিয়া ধ্যানস্তিমিতলোচন সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিগ্রহ যেন হাসিমুখে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন। সন্ধ্যাবন্দনা শেষে সনাতন যেমন বণিকের দিকে চাহিলেন, বণিক তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া সাধুর কৃপা ভিক্ষা করিলেন। সনাতন কহিলেন "আমি ভিখারী সন্ন্যাসী—আমি কি করিতে পারি?" করুণার্দ্র দৃষ্টিতে ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলেন, 'বণিক, আপনার কথা এই ঠাকুরের কাছে নিবেদন করুন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইলে আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে।' রামদাস তখন কুটীরদুয়ারে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া 'মানস' করিলেন, "ঠাকুর, যদি আমার নৌকাগুলির উদ্ধার হয় তবে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এবার যাহা লাভ হইবে সেই সমস্ত অর্থ তোমার সেবায় ব্যয় করিব।" এই বলিয়া ফিরিয়া যাইতে না যাইতে রামদাস দেখিলেন, যমুনায় অকস্মাৎ জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে। পণ্যবাহী তরণীগুলি জলে ভাসিতেছে।

সেবার মথুরায় পণ্য বিক্রয় করিয়া বণিকের চতুর্গুণ লাভ হইল। তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া সনাতনকে সকল কথা বলিলেন। সনাতন ভাবিলেন ঠাকুরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র। তিনি এবার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলেন। রামদাস যথাসময়ে ঠাকুরের জন্য একটী সুন্দর মন্দির, জগমোহন, নাটশালা ও তোরণদ্বার নির্মাণ করিলেন। সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া উৎসর্গ করিলেন। মহাসমারোহে সনাতনের মদনগোপাল নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। রামদাস সপরিবারে সনাতনের নিকট দীক্ষা লইয়া মুলতান নগরে অপর একটী মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামদাসের মন্দিরের দক্ষিণে আর একটী সুন্দর মন্দির আছে। উহার সমস্ত গাত্র প্রস্তর-ফলকে

অপূর্ব কারুকার্যখচিত। বঙ্গজ কায়স্থ-কুল-তিলক বঙ্গাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত স্বনামধন্য রাজা বসন্ত রায়ের পিতা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গুণানন্দ এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের পূর্বগাত্রে দ্বারের উপর একটী প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি আছে, তাহা হইতে গুণানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রবাদ হইতে এখনও জানা যায়, এই গুণানন্দ বসন্ত রায়ের পিতা। রামদাসের দ্রুত নির্মিত মন্দির দৈন্য দশায় পড়িবার পূর্ব হইতে ৺মদনগোপাল বিগ্রহ এই গুণানন্দের মন্দিরে পূজিত হইতেন। ওড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নৃপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হন। তাঁহার পুত্র পরমভক্ত পুরুষোত্তম জানা দুইটি রাধিকা মূর্ত্তি গঠন করাইয়া শ্রীবিহীন বিগ্রহের জন্য বৃন্দাবনে পাঠান। স্বপ্নাদেশ ক্রমে উহার ছোটটি শ্রীরাধা রূপে ৺মদনগোপালের বামে ও বড়টি শ্রীললিতা রূপে উঁহার দক্ষিণে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতে থাকেন। তখন হইতে ৺মদনগোপালের নাম পরিবর্তিত হইয়া ৺মদনমোহন হয়। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে ৺মদনমোহন প্রভৃতি বৃন্দাবনের দেববিগ্রহগুলি জয়পুরে নীত হন। সেখান হইতে রাজশ্যালক করৌলির রাজা গোপালসিংহ ঐ ৺মদনমোহন মূর্ত্তি পান। এখন করৌলিতে মূল ৺মদনমোহনের সেবা চলিতেছে। কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরা অন্য ৺মদমমোহন বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন আদিত্যটিলার বাহিরে বৃন্দাবনের পুরানো সহরে রাস্তার ধারে সেই প্রতিভূ মদনমোহনের পূজাদি চলিতেছে।

সনাতন আরও অনেক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তীর্থোদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমস্ত ব্রজভূমির সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণ এই চারিটি মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে মহারাজ বজ্রনাভবিনির্মিত শ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ বিরাজ করিতেন, তাহা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ছিল। উহার আবিষ্কার করিবার জন্য রূপের মনে একান্ত বাসনা হয়। তিনি যখন ভ্রাতার সঙ্গে তীর্থস্থানের

অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন কোথায় যোগপীঠ, কোথায় গোবিন্দ তাহাই চিন্তা করিতেন। একদিন রূপ গোস্বামী যখন যমুনা তীরে নির্জন স্থানে বসিয়া সজল নেত্রে শ্রীভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক পরম সুন্দর ব্রজবাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া গেলেন, "যেখানে এখন গোমাটিলা দেখিতেছ, এইস্থানে প্রত্যহ পূর্বাহ্নে একটি গাভী আসিয়া একটি স্থানে দুগ্ধ বর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়, এই স্থানে গোবিন্দবিগ্রহ আছেন।" সে কথা শুনিতে শুনিতে রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিছুক্ষণ পরে নয়ন মেলিয়া দেখিলেন ব্রজবাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন। অবিরাম অশ্রু নিষিক্ত হইতে হইতে নিকটবর্ত্তী ব্রজবাসীদিগের নিকট সংবাদ বলিলেন। তাঁহারাও কেহ কেহ গাভী কর্ত্তৃক দুগ্ধ বর্ষণের কথা জানিতেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তখন আবাল-বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া গোমাটিলা নামক প্রাচীন ভগ্নাবশেষের উচ্চ স্তূপে আসিয়া দুগ্ধধারাসিক্ত স্থানের সন্ধান পাইলেন এবং খনন করিয়া প্রাচীন বিগ্রহ পাইয়া আনন্দধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিলেন। গোমাটিলা যে পুরাতন যোগপীঠ এবং সেই "কোটী মন্মথমোহন" শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটি যে প্রাচীন ৺গোবিন্দ বিগ্রহ, তাহা রূপ গোস্বামী সপ্রমাণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে এই কথা রাষ্ট্র হইল। কয়েকদিন ধরিয়া ঐস্থানে মহোৎসব চলিয়াছিল।

বিগ্রহ প্রাপ্তিমাত্র রূপ গোস্বামী নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন। মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইয়া স্বীয় পার্ষদ কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং "গৌর গোবিন্দ" নামক নিজের একটি স্বরূপ বিগ্রহ কাশীশ্বরের সঙ্গে দিলেন। কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দদেবের মূর্ত্তির সন্নিকটে তাঁহার সেই ইষ্টবিগ্রহ স্থাপনা করেন। উহার কিছুদিন পরে সনাতন মথুরা হইতে মদনগোপাল আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ তখনও প্রকৃষ্ট বিধানে মহাসমারোহে ৺গোবিন্দদেবের অভিষেক হয় নাই। ১৫৩৬ খ্রীঃ মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ৺গোবিন্দদেবের অভিষেক হয়।

ইহার অনেক পূর্বে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সন্নিকটে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার কোন শিষ্য গোবিন্দের জন্য মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ নিজের মনোমত অলঙ্কারে বিগ্রহকে ভূষিত করিলেন। সেই জগমোহনে বসিয়া রূপ, সনাতন ও অন্যান্য ভক্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে রঘুনাথের মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন।

কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানের পূর্বে গোবিন্দদেবের পার্শ্বে শ্রীরাধিকামূর্ত্তি সংস্থাপিত হন। উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর ভক্তশিষ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র পুরুষোত্তম জানা রাজা হন। তিনিই ২টি রাধিকামূর্ত্তি ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু স্বপ্নাদেশ হয়, এবং তদনুসারে মূর্ত্তি দুইটি ৺মদনগোপাল বিগ্রহের নিকট স্থাপিত হন। কথিত আছে, কোন এক সময়ে বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধা উৎকলে বৃহদ্ভানু নামে এক দক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের গৃহে আসেন এবং কন্যাতুল্য স্নেহসিক্ত সেবায় বাস করেন। ঐ স্থানের নাম হয় রাধানগর। কিছুকাল পরে পুরীর রাজা স্বপ্নাদেশক্রমে ঐ মূর্ত্তি আনিয়া পুরীর নিকটে চক্রবেড় নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে সেই মূর্ত্তি লক্ষ্মী বলিয়াই পূজিতা হইতেন। পুরীর রাজা পুরুষোত্তম এই লক্ষ্মী মূর্ত্তিকেই মহা-সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া ৺গোবিন্দদেবের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং তিনিই শ্রীরাধা হইয়া গোবিন্দের বামে বসিলেন। সেইভাবে এখনও আছেন, তবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে মূল বিগ্রহ জয়পুরে নীত হন এবং এখনও সেইখানে আছেন। প্রতিভূ-বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া পরে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দিরটি সম্ভবতঃ তত সুন্দর বা বৃহৎ ছিল না। বহু বৎসর পরে সেই মন্দির জীর্ণ ও সৌন্দর্যবিহীন হইলে অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ ৺গোবিন্দদেবের সুবৃহৎ এবং অপূর্ব কারুকার্যখচিত পাষাণমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ইহা হয় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৺গোবিন্দদেবের প্রথম প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সময়

হইতে প্রায় ৫৫ বৎসর পরে। মন্দিরগাত্রের একটা শিলালিপিতে ইহা খোদিত আছে।

মানসিংহ যখন ৺গোবিন্দদেবের মন্দির গঠনে উদ্যোগী হন তাহার পূর্ব হইতে আকবর বাদশাহ জয়পুরী লাল পাথর দিয়া আগ্রার বিশাল দুর্গ নির্মাণ করিতেছিলেন। এই লাল পাথর তখন অন্য কাহারও পাইবার অধিকার ছিল না। মানসিংহের অনুরোধে বাদশাহ একমাত্র তাঁহাকেই গোবিন্দ মন্দিরের জন্য বিনামূল্যে এই পাথর লইতে দিয়াছিলেন। তবুও তখনকার সেই সুলভ মজুরীর দিনে গোবিন্দ মন্দিরের ব্যয় তের লক্ষ টাকা হইয়াছিল। রক্তপাষাণে নির্মিত এই বিরাট মন্দির মোগল আমলের ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যের একটি অতুলনীয় নিদর্শন। পাশ্চাত্য সমালোচকগণও বলিয়া গিয়াছেন এমন মনোহর মন্দির উত্তর ভারতে আর নাই।

যোগপীঠের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলে পাষাণ গাত্রে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর দেবীমূর্তি দেখা যায়। ইনি নন্দসূতা যোগমায়া দেবী বলিয়া পরিচিতা। নিকটবর্তী বৃন্দার মন্দিরের প্রাচীরে হিন্দী অক্ষরে একটি লিপি আছে, তাহার অর্থ—আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) পৃথ্বীরাজাধিরাজবংশীয় ভগবন্ত দাসের পুত্র মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্মিত হয়। এই নির্মাণ কার্যে প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন কল্যাণ দাস। মাণিক দাস চোপাও তাহার সহকারী ছিলেন। দিল্লী নগরীর কারিগর গোবিন্দ দাস ছিলেন প্রধান শিল্পী। প্রধান কর্মচারী গণেশ দাস বিমবল এই বিরাট ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বর্ষে মানসিংহ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও শতাধিক বর্ষ ধরিয়া এই বিরাট মন্দিরে মহাড়ম্বরে নিত্যোৎসব হইত। মন্দিরের প্রধান চূড়া এত উচ্চ ছিল যে, তথাকার আলোকমঞ্চ আগ্রা হইতে দেখা যাইত। একদা আওরঙ্গজেব শুনিতে পাইলেন যে, সেই আলোকরাশি হিন্দু মন্দিরের উচ্চ চূড়া হইতে বিচ্ছুরিত। তখন তিনি একজন ফৌজদার পাঠাইয়া

তখন গোবিন্দদেবের মূল মন্দিরটি এবং তাহার সংলগ্ন বিপুল সৌধের অপর পাঁচটি চূড়া একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলেন। একমাত্র মথুরা সহরেই ৬৩টি মন্দির তাঁহার আদেশে বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, ফৌজদার ব্রজমণ্ডলে পৌঁছিবার পূর্বেই ৺গোবিন্দদেব প্রভৃতি প্রধান-প্রধান বিগ্রহ ত্বরিত গতিতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন।

মানসিংহের মন্দির ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ভগ্নদশায় পড়ে। উহার মূল মন্দির এক্ষণে নাই। ছয়টি চূড়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। নাট মন্দিরের ছাদ নাই। বহুদিন সংস্কারাভাবে অসংখ্য বৃক্ষবল্লরীর মূল বিদ্ধ হইয়া এত সুদৃঢ় মন্দিরটিরও অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। ১৮৭৩ সালে মহামতি গ্রাউস সাহেব (Growse) যখন মথুরার কালেক্টর ছিলেন তখন তিনি গোবিন্দমন্দিরের সংস্কারকার্যে সহায়তা করেন। ভগ্নাবশেষের স্তূপীকৃত আবর্জনারাশি দূরীকৃত করিয়া উহার ভিতর ও বাহিরের সংস্কার করিয়া, গম্বুজের উপর দিয়া মুসলমানগণ যে দেওয়াল তুলিয়া মন্দিরশিখর হৃতশ্রী করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই মন্দির গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্য বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজ। গ্রাউস সাহেবের প্রার্থনানুসারে সংস্কারের সাহায্য কল্পে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য স্বীয় মতানুসারে বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সনাতনের উপর ভারার্পণ করেন। পুরী হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন প্রভুর আদেশ পালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং প্রথম হইতেই প্রাচীন শাস্ত্র সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। সনাতন ও রূপের বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠানের পর হইতে বৃন্দাবনে ভগবৎপ্রেমের আগুন জ্বলিয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে বহু বিদগ্ধ ভক্তের সমাবেশ হইতেছিল। সনাতন ও রূপ অধ্যক্ষের মত ব্যবস্থা করিয়া এই সকল ভক্তগণের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে আনিতে লাগিলেন। বনাচ্ছন্ন পর্ণকুটীরের মধ্যে স্তূপীকৃত

গ্রন্থরাশির অন্তরালে বসিয়া-বসিয়া সেই কৌপীনধারী বৈষ্ণবেরা সচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতই বৈষ্ণব মতের সর্বোৎকৃষ্ট প্রামাণ্যগ্রন্থ। ভাগবতের বিভিন্ন টীকার মধ্যে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীধরস্বামীকৃত "ভাবার্থদীপিকা" বা বিজয়ধ্বজ তীর্থ কৃত "পদরত্নাবলী" টীকাকে অসাম্প্রদায়িক এবং অনাবিল বৈষ্ণব ভাবের টীকা বলিয়া ধরা যায়। এতদ্ভিন্ন বীর রাঘবাচার্যকৃত "ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা" টীকা শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। শুকদেব কৃত "সিদ্ধান্তপ্রদীপ" নিম্বার্ক মতানুযায়ী এবং বল্লভাচার্য প্রণীত "সুবোধিনী" বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বিশেষত্ববিশিষ্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের চারিটি প্রধান টীকা আছে—সনাতন গোস্বামীর "বৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণী", জীব গোস্বামীর "ক্রমসন্দর্ভ", বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "সারার্থ-দর্শিনী" এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের "বৈষ্ণবানন্দিনী"। এইগুলির মধ্যে সনাতন কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বা শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডের বিস্তীর্ণ বৈষ্ণবতোষণী টীকা যেরূপ ভাবে সকল দুরূহ স্থলে অত্যুজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে, এমন কোন প্রাচীন টীকায় করে নাই। ইহা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনই রসমাধুর্যযুক্ত। কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। এই জন্য তিনি দেহত্যাগের পূর্বে ঐ গ্রন্থ আরও সংক্ষিপ্ত, আরও সুবোধ্য করিবার জন্য শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করেন। জীব গোস্বামী জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞায় যে গ্রন্থ রচনা করেন উহারই নাম "লঘুতোষণী"। "বৈষ্ণবতোষণী" রচনাকালে শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস সনাতনের সন্নিকটে সহচর ও সহকারী ছিলেন। বাস্তবিক এ-সময়ে সনাতন অতীব বৃদ্ধ, এক প্রকার চলচ্ছক্তিরহিত। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবতোষণী সমাপ্ত হয়, সেই বৎসরেই সনাতন লোকান্তরিত হন।

সনাতনের অন্যান্য গ্রন্থ উহার পূর্বেই সম্পূর্ণ হয়। লঘুতোষণীতে সনাতনের গ্রন্থসমূহের নাম লিপিবদ্ধ আছে, গ্রন্থগুলির নাম—"বৃহদ্ভাগবতামৃত" (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ), "হরিভক্তিবিলাস" ও তাহার "দিগ্‌দর্শিনী" টীকা এবং "লীলাস্তব"।

"হরিভক্তিবিলাস" নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ সনাতনের রচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা গোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ কর্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া প্রচারিত আছে। গোপাল ভট্ট যে একক গ্রন্থকার নহেন তাহা ঠিক কথা; তিনি প্রারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া সমস্ত শাস্ত্র হইতে মত সমাহার করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস এই চারিজন সে সময় একত্র বাস করিতেন। নবমতের শাস্ত্রশাসন সংগ্রহকালে তাঁহারা সকলে একমত হইয়া যে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন, উহা সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল ভট্টের নামে বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বিরাট গ্রন্থের একমাত্র টীকা "দিগ্‌দর্শিনী"—উহা সনাতনের নিজরচিত। সনাতন এমনভাবে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া যাবতীয় প্রমাণ-প্রয়োগে সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্যার নিরসন করিয়া দিয়াছেন যে, গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। দক্ষিণদেশ হইতে আগত মহাপ্রভুর অনুগৃহীত গোপাল ভট্ট এবং বঙ্গদেশাগত মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য মহাপ্রবীণ সনাতন এই উভয়ের নাম-মাহাত্ম্যে সমগ্র ভারতবাসী বৈষ্ণবেরা এই গ্রন্থের বিধিনিষেধসমূহ বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসেন। উহার ১০ বৎসর পরে রূপ গোস্বামী কর্তৃক "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। এই দশ বৎসরের মধ্যে "হরিভক্তিবিলাস" ও তাহার সনাতনকৃত টীকা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে হরিভক্তি বিলাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। সনাতন গোপাল ভট্টের সহযোগে যেমন হরিভক্তিবিলাস সম্পাদন দ্বারা বৈষ্ণবকৃত্য ও বৈষ্ণব আচার বিষয়ক শাস্ত্রানুশাসন সঙ্কলন করিয়া প্রভুর আদেশ পালন করেন, সেইরূপ অনুজ রূপ গোস্বামীর সহযোগে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" রচনা করিয়া ভক্তিসাধনপ্রণালী ও রসভাবের মাধুর্য প্রকটন করেন। এ গ্রন্থও উভয় ভ্রাতা একযোগে সঙ্কলিত করেন, কিন্তু রূপের নামই গ্রন্থকার রূপে ভারতবিখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত কথা, যিনিই গ্রন্থ লিখুন, বয়সে

বা পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধিতে বা ভক্তিতে সনাতন সর্বপ্রধান ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মতি বা সহযোগিতা ব্যতীত কেহ কোন মতাদির খণ্ডন-স্থাপন বা নূতন কোন উক্তির প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না।

ইষ্টমূর্তির সেবা ও তৎসম্পর্কীয় ভজনকীর্তন সময়ে সনাতনের মুখ হইতে যখন-তখন যে সকল স্তব ও প্রার্থনা স্ফুরিত হইত তাহারই নাম "লীলাস্তব"। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত; এই সকল স্তব হইতে সেই লীলাময়ের চরিত্রগুণই চিত্রিত হইয়াছে। এই জন্য এই লীলাস্তবের অপর নাম "দশম চরিত"। জীব গোস্বামী এই স্তবরাজি সংগৃহীত করিয়া পৃথক গ্রন্থে সঙ্কলন করেন। কিন্তু সনাতনের সকল গ্রন্থের মধ্যে "বৃহৎ ভাগবতামৃতই" প্রধান।

পূজ্যপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব ধর্মের মর্ম বুঝিবার, সাধনভজনের সুগম সোপান অবলম্বন করিবার, বিবিধ লোক ও বিবিধ অবতারের তত্ত্ব অবগত হইবার, শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম পাইবার যদি চূড়ান্ত কোন গ্রন্থ থাকে, তাহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে এক একটি আদর্শ ভক্তকে অবলম্বন করিয়া এই প্রাকৃত প্রপঞ্চ হইতে অনায়াসে সেই প্রাকৃত আনন্দধামে যাইতে পারেন, পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থে তাহার সোনার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সরল গল্পের ভিতর দিয়া সকল সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া দিবার, এক কথায়, অতি সহজে মানবজন্ম সফল করিবার এমন গ্রন্থ আর নাই।" গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। রচনার মধ্যে যেমন ভাষা ও অলঙ্কারের আড়ম্বর আছে, তেমনই বহু গুরুতর জটিল বিষয়ের আলোচনার জন্য ইহা সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য, সেইজন্য সনাতন নিজের গ্রন্থের এক বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। হরিভক্তিবিলাসের টীকার মত এই টীকারও নাম দিয়াছিলেন—"দিগ্‌দর্শিনী"।

ভাগবতামৃতের উপক্রমণিকা এইরূপ—ব্রাহ্মণশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করত ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতে

করিতে যখন জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট দিন কয়েকটির সমাপ্তির সমীপবর্তী হইতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উত্তরা স্বল্প সময়ে ও সংক্ষেপে ভাগবত কথার সারমর্ম জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। পরীক্ষিৎ জননীর তৃপ্তি সাধনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং যাহা উত্তরকালে জৈমিনি মুনি স্নেহবশে পরীক্ষিতপুত্র মহারাজ জনমেজয়কে শুনাইয়াছিলেন সেই অমৃতময় উপাখ্যানই 'ভাগবতামৃত'। পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চা ও সাধকের সাক্ষাৎ অনুভূতি এই উভয়ের একত্র সমাবেশে যে নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা দুর্লভ পরম পদার্থ। ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে শাস্ত্র ও অধ্যাত্মসাগরের মন্থনলব্ধ অমৃতের আস্বাদন পাইয়া থাকেন।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে সাতটি করিয়া অধ্যায় আছে। প্রথম খণ্ডে মঙ্গলাচরণের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের যে নয়নাভিরাম চিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে যমুনা, গিরিগোবর্দ্ধন ও মথুরার মাহাত্ম্যের জয় গান করা হইয়াছে। সেই গানে রাধারাণীর নূপুর-শিঞ্জন অনুভূত হয়। তৎপরে দেব-নরের মধ্যে সকলেই কেমন বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য পরীক্ষিৎ নারদের সর্বলোকভ্রমণের এক বৃত্তান্ত বলিতেছেন—

একদা প্রয়াগধামে মাঘ মাসে এক ব্রাহ্মণ কোন এক যজ্ঞমহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া নারদ মুনির সাক্ষাৎ পান। মুনিবর সর্বপ্রথমে দক্ষিণ দেশীয় জনৈক নৃপতির ভক্তির চিত্র দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অমরাবতীতে ইন্দ্র, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা ও শিবলোক কৈলাসে গিয়া শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেখিলেন সকলেই কৃষ্ণভক্ত। শিবের মুখে কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি সুতলে গিয়া বৈষ্ণবকুল-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে সন্দর্শন করিলেন; তাহার মুখে হনুমানের দাস্য ভক্তির বার্তা শুনিয়া কিম্পুরুষবর্ষে সেই মহাবীরের দর্শন লাভ করিলেন; তাঁহার নিকট কৃষ্ণাবতারের কথা এবং পাণ্ডবগণের কৃষ্ণ-ভক্তির প্রশংসা শুনিয়া মুনিবর ইন্দ্রপ্রস্থে অবতরণ করিলেন। পাণ্ডব-সভায় আসিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তির অপূর্ব আখ্যান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের

রাজধানী দ্বারকায় আসিলেন। সেখানে উদ্ধব, উগ্রসেনাদি যাদবগণের অনির্বচনীয় সেবা-ভক্তির দিব্য ছবি দেখিলেন। পরীক্ষিৎ মাতার নিকট সেই ভূমানন্দে মাতোয়ারা দেবর্ষির নৃত্য-গীত বর্ণনার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার বহু আখ্যায়িকা বিবৃত করিলেন। ব্রজ-দ্বারকায় গোপ-গোপী ও যাদবগণের ভক্তির চিত্র ও নন্দনন্দনের লীলামাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতামৃতের প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেবর্ষির ভ্রমণকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া স্তরে স্তরে শান্তদাস্যাদি সর্ববিধ ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। এই প্রকার যে যে সাধন পথে অগ্রসর হইয়া ভক্তগণ অন্তিমে যে যে ধাম প্রাপ্ত হন, দ্বিতীয় খণ্ডে জৈমিনী তাহাই সবিস্তারে মহারাজ জনমেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ভাগের অপর নাম গোলক-মাহাত্ম্য খণ্ড; ইহাতে ক্রমান্বয়ে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভজনপ্রণালী, বৈকুণ্ঠধাম, প্রেম, অভীষ্ট লাভ এবং সর্বশেষ কৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে জগদানন্দ বা ব্রজমাধুরী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তির প্রণালী ও তাহার চরম ফল সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের সারসিদ্ধান্তগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সাধক যে সিদ্ধির জন্য চিরলালায়িত, ভাগবতামৃত সেই অমৃতের খনি। দেবগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃতলাভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহারা অমর; সনাতন শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া ভক্ত-সমাজকে অমৃতের আস্বাদন করাইয়াছেন এবং নিজে অমর হইয়াছেন।

রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্প বয়সে পরম পণ্ডিত। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপংক্তির মত সুন্দর, তাঁহার ভাষাও তেমনি মার্জিত, অলঙ্কৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনা সর্বত্রই গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সেই গুরু-গম্ভীর শব্দ-সম্ভারে ভারাক্রান্ত শ্লোকগুলি পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনী-প্রসূত বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং উহাদের কবিত্বকৌশলে মুগ্ধ হইতে হয়। রাজকর্মচারী থাকার কালেও তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চায় বিরত হন নাই, তাঁহার কবিপ্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে নাই। সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসার

পর যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহা লইয়া তদ্গতচিত্ত থাকিতেন তখন ভাষা আসিয়া যেন দাসীর মত উহা বহন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য গ্রন্থিত করিয়া রাখিত। কত কাব্য, নাটক, স্তোত্র, শাস্ত্র সংগ্রহ, সারার্থ-ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনীমুখে প্রকাশিত হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "লঘুতোষণী" গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় দেওয়ার কালে রূপগোস্বামী কৃত গ্রন্থরাজির নাম করিয়াছেন—হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ নামক তিনখানি কাব্য; স্তবমালা, উৎকলিকাবলী, গোবিন্দ পদাবলী ও প্রেমেন্দুসাগর এই চারিখানি স্তোত্রগ্রন্থ; বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক দুইখানি নাটক, দানকেলিকোমুদী নামক একখানি ভণিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি নামক দুইখানি রসগ্রন্থ এবং মথুরামহিমা, নাটকচন্দ্রিকা, পদ্যাবলী ও লঘুভাগবতামৃত এই চারিখানি সংগ্রহ পুস্তক—মোট ষোলখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক প্রবন্ধ, শ্লোক ও টীকা আছে।

রূপ গোস্বামী ধ্যান করিবার সময় কখনও কখনও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া যে সকল স্তবস্তুতি রচনা করিতেন উহা তাঁহার কাগজ-পত্রে যেখানে সেখানে লেখা থাকিত। তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় শিষ্য জীব গোস্বামী ঐ সকল একত্র করিয়া স্তবমালা নামে অভিহিত করেন।

শ্রীরূপ কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" এবং "উজ্জ্বলনীলমণি" সর্বপ্রধান। এই দুইখানি রসগ্রন্থ নামে খ্যাত। সনাতন ও রূপ উভয় ভ্রাতা একযোগে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করেন। কিন্তু তন্মধ্যে সনাতন বিচারকর্তা। রূপ তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গ্রন্থখানি ক্রমে ক্রমে বহু বৎসর বসিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এজন্য তিনিই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। ইহাতে রূপ মুখ্য ভক্তিরসকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতে ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত সংস্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে

কতকগুলি লহরী আছে। সামান্য সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে ভক্তি চারি প্রকার। তন্মধ্যে সাধন ভক্তির দুই শাখা—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তির অভ্যাসে ও সাধনায় চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ জড়ভাব ত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই ভক্তি লাভই পরমার্থ লাভের নামান্তর।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শান্তদাস্যাদি মুখ্যরসের বর্ণনাকালে অতিশয় গূঢ় বলিয়া মধুররসের কথা অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ মধুররসের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য "উজ্জ্বলনীলমণি" নামক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রথমেই বহুপ্রকার নায়িকার প্রকৃতি, অবস্থা, ভাব, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কৃষ্ণই ব্রজলীলার নায়ক। তাঁহার নায়িকা বা কৃষ্ণ-বল্লভাগণ স্বকীয়া ও পরকীয়াভেদে দুই প্রকার। এই গ্রন্থই পরকীয়া মতের ভিত্তিস্বরূপ। এই পুস্তকে প্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রেমের দুই অবস্থা—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ বা বিরহেরও চারিটি অবস্থা আছে—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস। বিরহের অবস্থা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরও প্রকারভেদ আছে। এই সকল অবস্থা লইয়াই আধুনিক কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মধুররসের যে এত বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা কোন গ্রন্থে হইতে পারে তাহা বোধ হয় উজ্জ্বলনীলমণি রচনার পূর্বে কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই।

শ্রীরূপ-কৃত সংগ্রহগ্রন্থগুলির মধ্যে "মথুরামহিমা"য় মথুরাতীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রোদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীরূপ রচিত এবং সংগৃহীত সকল গ্রন্থমধ্যে লঘুভাগবতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহা তাঁহার অগ্রজ সনাতনকর্ত্তৃক রচিত বৃহদ্ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার। তিনি লঘুভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে দেখাইয়াছেন সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু-আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। মার্কেণ্ডয়াদি ভক্তগণ মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের অপেক্ষা যাদবগণ শ্রেষ্ঠ, যাদব-

গণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজগোপীগণ এবং তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ। নিখিলশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলন করিয়া ভক্তজনমণ্ডলীর গুরুস্থানীয় হইয়াছেন।

অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্ত শক্তি লইয়া সনাতন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগে শ্রীচৈতন্যের মত তত্ত্বদর্শী শক্তিধর কেহ ছিলেন না। তিনি নিজেই সনাতনের শক্তির কথা বলিয়াছেন—

"আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝায়াছ ব্যবহার-ভক্তি॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ক্রমে মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন, সনাতন বিগ্রহসেবা লইয়া ব্যাকুল থাকিতেন। তিনি রাগানুগা ভক্তির মধুরভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে দিনে দিনে এমন দীন-হীন কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন যে, তাঁহার ত্যাগের জীবন যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাপস-দিগেরও চরম আদর্শ হইয়া থাকিবে। সনাতন ও রূপের ত্যাগ, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির কথা দেশে সর্বত্র প্রচারিত হইল। শত শত ভক্ত দূর-দূরান্তর হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া মানবরূপী দেবতা সনাতনকে দেখিতে চাহিলে বৃন্দাবনের কর্তা, রূপ গোস্বামী তাহাদের লইয়া গিয়া অগ্রজের সাধনকুটীরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। সনাতনের নিজের গ্রন্থরচনার কার্য শেষ হইয়া আসিলে স্বল্পাবশিষ্ট জীবনের শেষবেলায় নির্জন সাধনার জন্য গিরিগোবর্দ্ধনের আশ্রয় লইলেন। তিনি নন্দীশ্বর গ্রামে মানসগঙ্গা নামক পুণ্য সরোবরের তীরে চক্রেশ্বর মহাদেবের কাছে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। সেজন্য সে স্থানের নাম বৈঠান। বৈঠানে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণ আরাধনা করিতেন। খাদ্যপানীয়ের জন্য কোন চেষ্টা ছিল না। স্নান বা নিদ্রার আবশ্যকতা ছিল না, সম্পূর্ণ অজগর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের পানে চাহিয়া-চাহিয়া শেষ দিনকয়টি কাটাইতেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবান স্বয়ং এক গোপবালকের মূর্তিতে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে

দুগ্ধপান করাইয়া যাইতেন। ক্রমে এই অঞ্চলে তাঁহার কথা প্রকাশ পাইল। ভক্তগণ তাঁহার জন্য কুটীর বাঁধিয়া দিলেন। এইস্থানে সনাতন গোস্বামী জীবনের বেলা শেষ করিয়াছিলেন। তদীয় অনুগত শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ছায়ার মত তাঁহার নিকটে থাকিতেন। সনাতনের বয়স তখন প্রায় ৯০ বৎসর। তিনি আর বৈঠান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ফিরিলেন না। রূপ মাঝে-মাঝে আসিয়া অগ্রজের পাদ-বন্দনা করিয়া যাইতেন। জীব আসিতেন। দাস গোস্বামীর সহিত মাঝে-মাঝে দেখা হইত। রঘুনাথের প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের মত জ্ঞানগিরির চরণতলে বিকাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈঠানে আসিয়াও সনাতন কিছুদিন গিরিগোবর্দ্ধনের পরিক্রম করিয়াছিলেন, শেষে আর সাধ্যে কুলাইত না। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার ইষ্ট দেবতা গোপবালকের বেশে আসিয়া তাঁহাকে একখানি প্রস্তরখণ্ড দিয়াছিলেন। তিনি উহারই চারিপাশে ঘুরিয়া পরিক্রমার কার্য সম্পাদন করিতেন। এই প্রস্তরখণ্ড চরণপাহাড়ী নামে খ্যাত।

"চরণপাহাড়ী"খানি সম্মুখে রাখিয়া আসনে বসিয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে শ্বাসের তরঙ্গে নাম জপ করিতেন। একদিন তিনি শিলাখণ্ডখানি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছেন যেন গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করিতেছেন—আর দেখিতেছেন যেন তাঁহার গোবর্ধনধারী প্রভু সেই চরণপাহাড়ীর উপর চরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ধ্যানস্তিমিত-লোচন ভক্তের অব্যক্ত অভিলাষ বুঝিয়া সত্য-সত্যই যেন তাঁহার ইষ্ট মূর্তি শ্রীরাধাশ্যামের যুগলরূপ তাঁহার নেত্র সমক্ষে স্বরূপে দেখা দিলেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ সনাতন দিব্যানন্দে আত্মহারা হইয়া রহিলেন, বাহিরে কোন ভাব-লক্ষণ নাই; নেত্রে পলক নাই, দেহে শ্বাসস্পন্দন নাই; সনাতনের সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। এইদিন ছিল ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

রূপ ছুটিয়া গিয়া সকল গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের সহিত জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, চিতাভস্ম আনিয়া ৺মদনমোহনের মন্দির সন্নিকটে সমাহিত করিলেন, বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধের ভক্তি-

প্রাবল্যে এক বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, রূপ নিজের কর্ম-শক্তির শেষ পরিচয় দিলেন।

প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে ৺মদনমোহনের মন্দিরে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গনে সমবেত ভক্তগণ লীলাকীর্তন করিবার সময়ে শ্রীবিগ্রহের বিষণ্ণ বদন লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অগ্রজ সনাতনকে রূপ গোস্বামী নিজের আরাধ্য দেবতার মত ভক্তি করিতেন। অগ্রজের জন্য শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রূপ শোকাচ্ছন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কুটীরকোণে আশ্রয় লইলেন; স্থানান্তরে যাইতেন না। নিস্তব্ধ হইয়া ইষ্টজপেই দিনযামিনী যাপন করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামী গোবিন্দের পানে চাহিয়া-চাহিয়া ইষ্টধ্যান করিতে করিতে চিরতরে নেত্র নিমীলিত করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই উভয় ভ্রাতা পরমধামে গমন করিলেন। ভক্তেরা সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল, বৃন্দাবন অন্ধকার হইয়া গেল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে ৮০টি লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহসকল প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ভক্তগণ কর্তৃক সেবাস্থাপনের সহায় হইয়া তিনি প্রকৃত ভক্তি-সেবার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও টীকাব্যাখ্যাদি দ্বারা রাধাকৃষ্ণলীলার গূঢ়তত্ত্ব ও সার-সম্পদ লোকসমাজে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভিত্তি ছিল না, সকল গোস্বামী মিলিয়া শাস্ত্র সঙ্কলন পূর্বক তাহাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবমতের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীজীব একদিকে যেমন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি কর্মজগতে অক্লান্তভাবে নিজ সংগঠনশক্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া সুনামধন্য পিতৃব্যদের উপযুক্ত শিষ্য হইবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরূপের পর বৃন্দাবনে থাকিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাঁহার উপর যে কর্তৃত্বের ভার পড়িয়াছিল তাহা নির্বাহে তিনি বৃন্দাবনে প্রায় ৬০ বৎসর অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণব জগতে এক চিরস্থায়ী ও আলোকোজ্জ্বল স্থান অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

সমসাময়িক ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়, শ্রীজীব ১৫১১ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বল্লভ (অনুপম) সনাতন ও রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ৺রঘুনাথ বিগ্রহের উপাসক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব ৺রঘুনাথের প্রতি অনুপম ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন অনুপম। এই অনুপমের একমাত্র পুত্র—শ্রীজীব। রামকেলির বাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিলে, "শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।"

মহাপ্রভু যখন কাশীর পথে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে একমাস অতিবাহিত করিয়া গৌড়ে আসেন। তথায় অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। শ্রীজীব বাকলায় ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন ৪।৫ বৎসর। বাকলার বাটীতেই শ্রীজীবের বিদ্যারম্ভ হয়। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদিগের মত শ্রীজীবেরও সুন্দর মূর্ত্তি। তাঁহার অপূর্ব মুখশ্রী সুপুরুষের লক্ষণ বিজ্ঞাপিত করিত। তিনি অতি অল্প বয়সেই অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় দেন।

শিশুকালের একবার মাত্র দর্শন হইতে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি ছায়ার মত তাঁহার নয়নে ভাসিত। লেখাপড়া করিতেন কিন্তু তাহারই

মাঝে সেই পিতৃহীন বালকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। লোকের মুখে শুনিতেন, তাঁহাদের বংশের কি উচ্চ পদগৌরব ছিল, তাঁহাদের গৃহে কি ঐশ্বর্যের হাট বসিয়াছিল। তাঁহাদের পরিবারের বিষয়ের কথা তখন উপকথায় পরিণত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাতদের ত্যাগের কথা লোক-মুখে শুনিতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেন। 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত আছে, শ্রীজীব তাঁহার মাতার নিকট জ্যেষ্ঠতাতদিগের ত্যাগের কথা, দৈন্যের কথা, ডোর-কৌপীন পরিয়া বৃন্দাবনে দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণের অপূর্ব গল্প শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের পথ অবলম্বন করিবেন—ইহাই স্থির করিলেন। ধর্মপ্রাণা ও ইষ্টসেবাপরায়ণা মাতা তাহাতে বাধা দেন নাই। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে তাঁহার কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা শেষ হইয়াছিল। বয়স তখন তাঁহার ১৯।২০ বৎসর। বেদান্ত দর্শন পড়িবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

নবদ্বীপ তখন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। শ্রীজীব প্রেমভাগের বাটীতে কিছুদিন কাটাইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। তাঁহার নবদ্বীপে পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ছিলেন। শ্রীজীব নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রেমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শেষে তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিয়া অশেষ আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীজীব নীলাচলে যাইতে চাহিলেন, অথবা যদি নিত্যানন্দের কৃপা পান, তবে তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "শ্রীজীব, তোমার জ্যেষ্ঠতাতদিগকে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের অধিকার দিয়াছেন, বৃন্দাবনই তোমার কর্মক্ষেত্র। যত শীঘ্র সম্ভব বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার কর।" শ্রীজীব তখনও বেদান্তাদি শাস্ত্র পড়েন নাই। নিত্যানন্দ তাঁহাকে কাশীধাম গিয়া বিখ্যাত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ঐ শাস্ত্র শিক্ষা করিবার উপদেশ দিলেন। শ্রীজীব তাঁহার উপদেশ মত পদব্রজে কাশীধামে গিয়া প্রায় চারি বৎসর থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে নূতনভাবে বেদান্ত শিক্ষা করিলেন। কাশীধামে থাকিতেই শ্রীজীব নীলাচলে মহাপ্রভুর অপ্রকট

হইবার সংবাদ পাইলেন। বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি দৈন্যবেশে ১৫৩৫ খ্রীঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

বহুকাল পরে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ বংশের একমাত্র বংশধর প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদরের একমাত্র কৃতীপুত্র, পরম বৈষ্ণব দিব্যকান্তি শ্রীজীবকে দেখিয়া সনাতন ও রূপ আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন এবং অন্যান্য গোস্বামী ও ভক্তগণের নিকট সহর্ষে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীজীব চিরজীবনের মত বৃন্দাবনবাসী হইলেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে নীলাচলে এবং অন্যত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক বিষাদের ছায়া পড়িল। বৃন্দাবনে গৌড়ীয়দিগের প্রতিপত্তি কিসে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, শাস্ত্রপঠন এবং ভক্তিধর্ম কিভাবে প্রচারিত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন হইলেন। নীলাচল হইতে প্রধান প্রধান মনীষী ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিয়া মহাপ্রভুর আদেশে, প্রাচীন বিগ্রহের অনুসন্ধান, নূতন মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন, শাস্ত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর মতের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত হইলেন। লোকনাথ, ভূগর্ভ, রূপ, সনাতন, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়াছেন। এইবার আসিলেন সর্বকনিষ্ঠ শ্রীজীব। তিনি সর্বপ্রধান গোস্বামীদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সকলের স্নেহের পাত্র, তদুপরি তাঁহার দিব্য রূপ, চারু চরিত্র এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যখন সকলের পরিচয় হইল, তখন আদরযত্ন ও শ্রদ্ধাতে তিনি সকলের স্নেহপুত্তল হইয়া গেলেন।

সনাতনের আদেশে রূপ তাঁহার দীক্ষাগুরু হইলেন। শ্রীজীব গুরুর নিকট ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন এবং পিতৃতুল্য গুরুজনদের সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুরা যখন শাস্ত্র লিখেন শ্রীজীব পার্শ্বে বসিয়া বাতাস দেন। তাঁহারা ক্লান্ত হইলে তাঁহাদের মুখের কথা শুনিয়া পুঁথি লিখিয়া দেন, সাধ্যমত আকর গ্রন্থের সন্ধান করেন। তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীরূপের কাছেই থাকিতেন, প্রয়োজন হইবামাত্র সনাতনের কাছে যাইতেন। উভয়ের সেবার ভিতর তিনি আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীরূপই বৃন্দাবনে গোস্বামী-গণের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্মকর্তারূপে বিবেচিত হইতেন। শ্রীসনাতন

অধিকাংশ সময় সাধনভজন ও শাস্ত্রগ্রন্থপ্রণয়ন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। শাস্ত্রে বর্ণিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার দরকার হইলে সাধারণত রূপই সেই কার্য করিতেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তর্কে আগ্রহী হইলে শ্রীরূপ বৃথা তর্কে কালক্ষেপণ না করিয়া তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিতেন। শ্রীজীব তখন অল্পবয়স্ক যুবক। তাঁহার ইহা পছন্দ হইত না। একবার বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবর্ত্তক, বয়সে প্রবীণ বল্লভাচার্য শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতের মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। রূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে বলিয়া যমুনাস্নানে গেলেন। শ্রীজীব বল্লভাচার্যকে চিনিতেন না। তাঁহার মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া তর্কে তাঁহাকে পরাজিত করেন। বল্লভাচার্য চলিয়া গেলেন কিন্তু পথে শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাতে ঐ ঘটনার কথা বলিয়া শ্রীজীবের প্রশংসা করিলেন। রূপ বুঝিলেন একজন যুবক প্রবীণ পুরুষের প্রতি অপব্যবহার করিয়াছেন। শাস্তি স্বরূপ শ্রীজীবকে বলিলেন 'চলিয়া যাও, তোমার মুখ আর দেখিব না।' শ্রীজীব গুরুর আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া এক জঙ্গলে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আহারাদি ত্যাগ করিলেন। কয়েকমাস ধরিয়া গ্রামের লোকেরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সামান্য কিছু দিলে আহার করিতেন নতুবা অভুক্ত থাকিতেন। শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। একদিন সনাতন সেই পথে যাইবার সময় শ্রীজীবের সংবাদ পাইয়া দেখিতে গেলেন। শ্রীজীব তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সনাতনের ইঙ্গিতে রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে আনিলেন এবং তাঁহার সহযোগে প্রায় এক বৎসর পর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" সমাপ্ত করিলেন (১৫৪১ খ্রীঃ)। পর বৎসর (১৫৪২ খ্রীঃ) শ্রীরূপ গোস্বামী শিষ্যের দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া পৃথকভাবে সেবা করিবার জন্য একটী ঠাকুর দিলেন—ইনিই ৺রাধাদামোদর। শৃঙ্গার বটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের কুটীরের সন্নিকটে ৺রাধাদামোদরের মন্দির নির্মিত হয়। মূল মূর্ত্তিটি আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের ভয়ে জয়পুরে নীত হন এবং সেখানেই আছেন।

৺রাধাদামোদরের সেবা স্থাপনের পর ১২।১৩ বৎসর চলিয়া গেল। এই সময় শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ অত্যন্ত বৃদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়িলেও অনেকগুলি দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিলেন। সেই কার্যে শ্রীজীব তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। শ্রীজীবই এখন একমাত্র সমর্থ পূর্ণবয়স্ক, অসাধারণ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত ও ভক্ত। সুতরাং তিনিই কার্যতঃ ব্রজমণ্ডলের কর্ত্তা হইয়া গুরুর আসন গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে তিনজন নূতন ভক্ত বঙ্গ ও ওড়িষ্যা হইতে বৃন্দাবনে আসিলেন। ইঁহারা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। উঁহারা যথাক্রমে গোপালভট্ট, লোকনাথ ও শ্রীজীবের শিষ্য হইলেন।

কাটোয়ার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে চাকন্দি গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বাস করিতেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে তিনি অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হন, এজন্য তাঁহার নাম হয় চৈতন্যদাস। পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ ইনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অলৌকিক এক পুত্র লাভ করিবেন। কিছুদিন পর চাকন্দিতে চৈতন্যদাসের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহারই নাম শ্রীনিবাস।

তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভাগবত পড়িবেন সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিলে নীলাচলের পথে শুনিলেন মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। পরে শ্রীখণ্ড হইতে ভাগবত লইয়া যাইবার কালে শুনিলেন গদাধর অপ্রকট হইয়াছেন। পরে নবদ্বীপে গিয়া শুনিলেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুও অপ্রকট হইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শান্তিপুরে সীতাদেবী এবং খড়দহে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সকলেই তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোবিন্দমন্দিরে শ্রীজীবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্রীজীব তাঁহাকে গোপাল ভট্টের নিকট লইয়া যান। গোপাল ভট্টের নিকট শ্রীনিবাস দীক্ষা লইলেন।

কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায় গরাণহাটি পরগণার কায়স্থ জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ রায়ের পুত্র রাজকুমার নরোত্তম আসিলেন। নরোত্তম রাজ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথের শিষ্য হইলেন তাহা লোকনাথের বৃত্তান্তের অন্তর্গত হইয়াছে। শ্যামানন্দ শ্রীজীবের নিকট দীক্ষা লইলেন।

শ্রীজীব ছিলেন বৃন্দাবনের মুখপাত্র। বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে শ্রীজীবই তাহার সমাধান করিতেন। কোন গ্রন্থ বা নিবন্ধ রচিত হইলে শ্রীজীবের সমর্থন ব্যতিরেকে উহা প্রচারিত হইতে পারিত না। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের খ্যাতি দেশময় বিস্তৃত। আকবর বাদশাহও শুনিলেন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সদলবলে আসিয়া বৃন্দাবনের সবকিছু দেখিলেন। সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীজীব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তি, দৈন্যবেশ, অলৌকিক তেজস্বী প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রভায় বাদশাহ বিমুগ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহিত যেসব হিন্দু রাজন্য ছিলেন তাঁহারা বৃন্দাবনে মন্দির নির্মাণের জন্য বাদশাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পাঠান আমল হইতে এইরূপ অনুমতি সহজে পাওয়া যাইত না। আকবর বাদশাহ সচ্ছন্দ চিত্তে সে অনুমতি দিলেন। তাঁহার বৃন্দাবনে আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি বৃন্দাবনবাসীদিগের জন্য কি করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভক্ত গোস্বামীরা কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা চাহিলেন রাজার সুদৃষ্টি, যাহাতে তাঁহারা শান্তিতে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্মচর্চ্চা করিতে পারেন। মৃগয়া উপলক্ষে লোকে বৃন্দাবনের পশুপক্ষী হত্যা ও তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ বৃক্ষরাজি কর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের প্রাণে বড় আঘাত দেয়। গোস্বামীগণ বলিলেন যে, যদি বাদশাহ ইহার প্রতিবিধান করিয়া দেন শ্রীভগবান তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন। আকবর তৎক্ষণাৎ ব্রজমণ্ডলে জীবহত্যা ও বৃক্ষাদি ছেদন নিষেধ করিয়া ফরমান বা আদেশপত্র দিয়া গেলেন। সেই আদেশ এখনও বলবৎ আছে। কেবলমাত্র আওরঙ্গজেবের সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার—শ্রীজীব গোস্বামীর স্মরণপথে সর্বদাই জাগরূক ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুজনের রচিত গ্রন্থগুলি ত ছিলই, তিনি স্বয়ং আজীবন পরিশ্রম করিয়া যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রধানগুলির নাম—

(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতু সংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চ্চদীপিকা, (৫) গোপাল বিরুদাবলী, (৬) শ্রীমাধব মহোৎসব, (৭) শ্রী সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, (৮) ভাবার্থচম্পূ, (৯) রসামৃত-শেষ (১০) পদ্ম-পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, (১১ শ্রীরাধিকার করপদ্ম-চিহ্ন (১২) শ্রীগোপালচম্পূ (পূর্ব ও উত্তর ভাগ), (১৩) ব্রহ্মসংহিতার টীকা (১৪) গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা, (১৫) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর ("দুর্গমসঙ্গমনী") টীকা, (১৩) উজ্জ্বলনীলমণির (লোচন-রোচনী) টীকা, (১৭) যোগসারস্তবের টীকা, (১৮) অগ্নিপুরাণোক্ত শ্রীগায়ত্রী বিবৃতি বা ভাষ্য, (১৯) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২০) ভগবৎসন্দর্ভ, (২১) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২২) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৩) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৪) প্রীতিসন্দর্ভ, এবং (২৫) ক্রমসন্দর্ভ।

এই তালিকায় শ্রীজীবের "লঘুতোষণী"র উল্লেখ নাই। সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের কেবলমাত্র দশম স্কন্ধ বা শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডের "বৈষ্ণবতোষণী" নামক টীকা করেন। সনাতনের নিজ আদেশক্রমে শ্রীজীব ঐ টীকার সংক্ষেপ করিয়া আরও সরল ভাষায় বহু বৎসর পরে (১৫০০ শকে) যে টীকা সমাপ্ত করেন তাহাই "লঘুতোষণী" নামে পরিচিত। সনাতনের টীকা "বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী" নামে খ্যাত হয়। লঘুতোষণীতে সনাতনের বংশবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতেই জানিতে পারি ইঁহারা কত উচ্চবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ নতুবা সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিত।

এই সময়ে বৃন্দাবনে যেমন বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-গ্রন্থাদি লিখিত হইতেছিল, বঙ্গদেশেও তেমনি অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস প্রভৃতি কেহ কেহ নিম্বকাষ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি গড়িয়া

পূজারম্ভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ তাঁহার জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ দাস ও স্বরূপ দামোদরের করচাগুলি এবং বৃন্দাবন দাস রচিত "চৈতন্যমঙ্গল"। ভাগবতের সহিত ঐক্য রাখিয়া এই গ্রন্থ রচিত বলিয়া শ্রীজীব প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ উহার নাম রাখেন "চৈতন্য ভাগবত"। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে উহার নাম "চৈতন্যমঙ্গল" আছে। একই সময়ে লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল" লিখিত হয়। উভয় গ্রন্থের "মঙ্গল" নাম হওয়ায় বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী দেবী সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের মত শুনিয়া নিজপুত্রের গ্রন্থকে "ভাগবত" আখ্যা দিতে বলেন।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ রচিত হওয়া মাত্র বৃন্দাবনে গিয়াছিল। ৺গোবিন্দ মণ্ডপে নিত্য বিকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবনে গেলে উহাও পঠিত হইয়া ভক্তবৃন্দের অশ্রুবারি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, উহাতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলায় তাঁহার অবতারের যে গূঢ় নাট্ট প্রকটিত হইয়াছিল তাহা বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেন নাই। তখন বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে চৈতন্যচরিতের এই শেষ লীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। তখন কৃষ্ণদাস পক্ককেশ বৃদ্ধ। তিনি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্য ঝামটপুরে (বর্দ্ধমান) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ। কৃষ্ণদাস ৬ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিয়া বৃন্দাবনে যান। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি গোবিন্দজীর মাল্য প্রসাদ এবং শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ প্রভৃতি সকল গোস্বামীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের বিপুল পরিশ্রমে অসাধারণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব মতের গ্রন্থচূড়ামণি এই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার রচনা শেষ হয়। পাণ্ডিত্যে এই গ্রন্থ অতুলনীয়।

অতঃপর বৃন্দাবনে শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দের চিন্তার বিষয় হইল মহাপ্রভুর আদেশে যে ভক্তিরসশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি রচিত হইল তাহা বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য দেশে কিভাবে প্রচার করা যায়। গোস্বামীগণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন—এই কাজের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র শ্রীনিবাস। একদিন অপরাহ্নে ৺গোবিন্দমন্দিরে যখন ভক্তগণ "ভাগবত" শুনিবার জন্য সমবেত তখন গোস্বামীগণের অভিপ্রায় শ্রীনিবাসকে জানান হইল। সকলে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা শীঘ্র গৌড়দেশে গিয়া গ্রন্থ ও ধর্মপ্রচার করুন। অমনি শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠের পুষ্পমালা অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া পড়িল, পূজারী উহা সাশ্রুনেত্রে সর্বসমক্ষে শ্রীনিবাসের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস স্বীকৃত হইলেন। সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দ যাইবেন। তাঁহাদের গুরুদেবগণও অনুমতি দিলেন। বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে এই দুঃখে তাঁহারা কাঁদিয়া ভাসাইলেন। কিন্তু উপায় কি?

শ্রীজীব গোস্বামী মথুরা ও আগ্রা হইতে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত কয়েকজনকে ডাকিলেন। তাহাদের সাহায্যে রাজধানী হইতে "রাজপত্র" আনা হইল। উহাতে বৃন্দাবন হইতে যাজপুর পর্যন্ত ঝাড়িখণ্ডের পথে যাইবার রাজাদেশ লেখা ছিল। তিন জন মহাজন সমস্ত ব্যয়ভার সচ্ছন্দে বহন করিতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল একখানি গরুর গাড়ীতে সমস্ত গ্রন্থগুলি একটি কাষ্ঠের সম্পুট-এর ভিতর যাইবে। সম্পুটটিতে কুলুপ দেওয়া হইল। জলবৃষ্টির ভয়ে মোমজামা দিয়া সমাবৃত করা হইল। অন্য একখানি গরুর গাড়ীতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ যাইবেন। দশজন অস্ত্রধারী হিন্দু প্রহরীস্বরূপ সঙ্গে যাইবে। সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে পথের ব্যয়ের টাকা দেওয়া হইল। গাড়ীখানি শ্রীগোবিন্দমন্দিরের সম্মুখে আনা হইল। সর্বত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, রাঘব পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গোস্বামীগণসহ বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়া ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। শ্রীগোবিন্দের আশীর্বাদ লওয়া হইল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে শেষে গাড়ী চালাইবার আদেশ হইল। সজল নেত্রে ভক্তগণ সকলের পশ্চাতে অনেকদূর চলিলেন। গাড়ী বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরার দিকে চলিল। শ্রীজীবের উৎসাহের অবধি নাই। তিনি, রাঘব পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস মথুরা পর্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথারসে অতিবাহিত করিলেন। শুভচিন্তা ও উদ্বেগ লইয়া একটি প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হইতে চলিল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লইয়া শ্রীজীব অন্য ভক্তগণসহ বৃন্দাবনে ফিরিলেন। কিছুদিন ধরিয়া গোস্বামী-দিগের সাক্ষাৎ হইলে গ্রন্থ প্রচারের কথাই একমাত্র আলোচনার বিষয় হইত। এদিকে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে রাজপথ বাহিয়া চলিলেন। দশজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় গাড়ী চলিতে লাগিল। সম্পুটের ভিতর যাহাই থাকুক পথে কেহ তাহার খোঁজ লইল না। রাজাদেশপত্র তাহার পথ উন্মুক্ত রাখিল। ক্রমে তাঁহারা আগ্রা হইয়া ইটোয়ার পথে রাজপথ ছাড়িয়া ঝাড়িখণ্ডের বনপথে প্রবেশ করিলেন। এই পথ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাতায়াত করিয়াছিলেন, সুতরাং এই পথই তাঁহাদের প্রিয় পথ। এই পথ দিয়া বহু লোক পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিল। তাঁহারা ঐ যাত্রীদের সঙ্গ ধরিলেন। এইভাবে তাঁহারা পঞ্চকোটে আসিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় উপনীত হইলেন।

তখন বিষ্ণুপুর স্বাধীন রাজ্য। ইহার অপর নাম মল্লভূমি। রাজারা মল্ল নামে খ্যাত। হাম্বীর মল্লের দুর্গ ছিল, শিক্ষিত সৈন্য ছিল, প্রজারা বশীভূত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। রাজার সৈন্যরা বসিয়া খাইত, কর্মের অভাবে দস্যুতা করিত। রাজার কাছে সংবাদ গেল গাড়ীর উপর সিন্ধুক, সঙ্গে ১৫ জন লোক। রাজা সিন্ধুক লুটিতে আদেশ দিয়া কহিলেন দেখিও যেন নরহত্যা না হয়। পরদিন রাত্রে ভক্তেরা গোপালপুর গ্রামে আসিয়া ক্লান্ত দেহে নিদ্রিত হইলেন। দস্যুরা আসিয়া গাড়ী লুটিয়া লইয়া গেল, লোক মারিল না। রাজবাটীতে লইয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিলে দেখা গেল ধনরত্ন নাই। পুঁথির পর পুঁথি সাজান, রাজা বিস্মিত হইলেন, আসল

ব্যাপার বুঝিলেন না, সংবাদ লইয়া জানিলেন কোন লোক হতাহত হয় নাই।

এদিকে শ্রীনিবাস শ্রীজীবের নিকট পত্র পাঠাইয়া সব সংবাদ দিলেন। পত্র পড়িয়া শ্রীজীব মাথায় হাত দিলেন—সকল গোস্বামীকে পত্র পড়িয়া শুনাইলেন, গোস্বামীরা সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সর্বাপেক্ষা মর্মাহত হইলেন রাধাকুণ্ডবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। একদিন রাধাকুণ্ডের ধারে বসিয়া বসিয়া সহসা উঠিয়া কুণ্ডসলিলে ঝাঁপ দিলেন—ভক্তরা তাঁহাকে উঠাইলেন তিনি আহারনিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিলেন, পরে গ্রন্থরাজি উদ্ধারের সুসংবাদ শুনিয়া অপ্রকট হন।

গ্রন্থ চুরির পর শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে নিজ নিজ দেশে পাঠাইলেন। তিনি নিজে লুণ্ঠিত গ্রন্থরাজির অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণবল্লভ নামে এক বিপ্রের নিকট শুনিলেন রাজা বীর হাম্বীর এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে—

"দিবায় পুরাণ পাঠ, রাতে চুরি ডাকাতি।
পুত্র সম পালে প্রজা দেশের না করে ক্ষতি॥"

শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভের গৃহে রহিলেন এবং বিকালে তাহার সঙ্গে রাজবাটীতে যাইয়া পুরাণপাঠ শুনিতে লাগিলেন। তখন ভাগবতের 'রাসপঞ্চাধ্যায়' পাঠ করা হইতেছিল। পাঠও হয় না, ব্যাখ্যাও কুব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দিন শ্রীনিবাস একটু প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন না। তখন সকলে তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সুযোগ আসিল, তিনি আসনে বসিয়া স্বীয় অসামান্য পাণ্ডিত্যের সহায়ে এবং ভক্তির আবেশে যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করিলেন তেমন সে দেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সভাস্থল নয়নজলে ভাসিল। রাজা নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাঠকের পরিচয় লইলেন। গ্রন্থচুরির বার্তা শুনিয়া শ্রীনিবাসকে লইয়া গিয়া লুণ্ঠিত গ্রন্থগুলি সিন্ধুক খুলিয়া দেখাইলেন এবং প্রত্যর্পণ করিলেন। তৎপরে অগ্রে কৃষ্ণবল্লভ ও

পুরাণপাঠক এবং পরে রাজা স্বয়ং শ্রীনিবাসের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

গ্রন্থগুলি পাওয়ামাত্র শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামীকে সংবাদ দিলেন। যে গাড়ীতে গ্রন্থ আসিয়াছিল রাজা সেই গাড়ী বোঝাই করিয়া ফলমূল মিষ্টাদি নিজ লোক দ্বারা শ্রীনিবাসের পত্রসহ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকেও সংবাদ দেওয়া হইল। সংবাদ যেদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিল সেদিন শ্রীজীবের আনন্দ দেখে কে? কুঞ্জে-কুঞ্জে ঘুরিয়া সকল ভক্তকে সংবাদ দিলেন, আর গাড়ী হইতে দ্রব্যসম্ভার লইয়া মন্দিরে মন্দিরে ভোগের জন্য পাঠাইলেন।

এদিকে শ্রীনিবাস রাজার প্রার্থনা মত একদিন রাজোপচারে গ্রন্থরাজির পূজা করিলেন এবং যাজগ্রামে মাতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ নরোত্তমের নিমন্ত্রণ পাইয়া খেতরীতে এক বিরাট উৎসবে যোগদান করিলেন। সে উৎসবের প্রধান আচার্য শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ওড়িষ্যা হইতে বহু শিষ্যসহ শ্যামানন্দ আসিয়াছিলেন। এই সময় খেতরীতে ঠাকুর নরোত্তম ৬টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উহার একটি শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ।

এই খেতরীর উৎসবের মত বৈষ্ণব উৎসব আর কোথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সমস্ত উত্তর বঙ্গ, এমন কি মণিপুর, পর্যন্ত বহু স্থান ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য দ্বারা পূর্ণ হইল। শ্যামানন্দ ওড়িষ্যা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ জীবকে উদ্ধার করেন। তাঁহার বারজন শিষ্য হইতে প্রধান বারটি শাখা হয়।

অতঃপর বিষ্ণুপুর এই ভক্তি ধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্র হইল। রাজাদেশে এমন হইয়াছিল যে, প্রজারা দিনান্তে একবার নাম কীর্ত্তন না করিলে রাজ্যে বাস করিতে পারিত না। ইহাকে "রাজার বেগার" বলা হইত।

এইভাবে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তিন জনে একদিন একসঙ্গে বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছিলেন এবং তিন জন গৌড় হইতে

নীলাচল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে প্রচারের ত্রিধারা বহাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে বৃন্দাবনে একটি একটি করিয়া দীপ নির্বাপিত হইতেছিল। সনাতন, রূপ ও ভট্ট রঘুনাথ পূর্বে গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাহার কিছু পরে প্রবোধানন্দ অন্তর্হিত হন। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভূগর্ভ, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ এবং তৎপর গোপাল ভট্ট গোস্বামী দেহরক্ষা করেন। রহিলেন শ্রীজীব। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে গোস্বামীগণের অন্ত্যেষ্টি ও সমাধির সুব্যবস্থা হইল। গোবিন্দদেবের বিরাট মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দির শ্রীজীবের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে বিনির্মিত হইয়া গেল। শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনে ও প্রচারে, নব ধর্মমতের বিপুল বিস্তারে এবং দেববিগ্রহের নিমিত্ত সুদৃঢ় মন্দির রচনায়—এই তিন ভাবে বৈষ্ণব মতের ভিত্তিমূল সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া সাধননিষ্ঠ কনিষ্ঠ গোস্বামী শ্রীজীব একদিন ইষ্টধ্যান করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪ বৎসর বয়সে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে আসেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ৬০।৬১ বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট হন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব হয়।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপে শ্রীরঙ্গপত্তন নগরী অবস্থিত। সেখানে মহাবিষ্ণু শ্রীরঙ্গনাথজীর এক বিরাট মন্দির আছে। ইহা শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধান কেন্দ্র। রামানুজ স্বামী এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের অনতিদূরে কাবেরী তীরে বেলগুঁড়ী গ্রামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেন। উঁহারা তিন ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যম ত্রিমল্ল ভট্ট, এবং কনিষ্ঠ অল্প বয়সে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া কান্দীতে শঙ্করাচার্য প্রবর্ত্তিত দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রকাশানন্দ। তাঁহার মত পণ্ডিত কেহ ছিল না। তিনি কাশীতে সন্ন্যাসীদের গুরুতুল্য ছিলেন। প্রকাশানন্দ ভক্তিপথ মানিতেন না। সুতরাং তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারভুক্ত সকলে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের নিত্য সেবা হইত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্কট ভট্টের যে পুত্রের জন্ম হয় তিনিই গোপাল ভট্ট—বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের অন্যতম।

শৈশব কালেই গোপাল তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দিতেন। তাঁহার খুল্লতাত গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে গোপালের প্রতি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দান করিতেন। পরবর্ত্তীকালে গোপাল ভট্ট প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাসে" আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। গোপাল বাল্যকাল হইতেই ভক্তিপথের পথিক। উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে নীলাচলে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি দেখিয়া একান্ত ভক্তিবিহ্বল হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে নীলাচলে আসেন, পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসের প্রথমে (১৫১০ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গোদাবরী তীরে ওড়িষ্যার রাজমন্ত্রী বিদ্যানগরের রাজা বৈষ্ণব-

চূড়ামণি রামানন্দ রায়কে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে পাইয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আষাঢ় মাসে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথজী দর্শন করিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গনে সমবেত সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বেঙ্কট ভট্ট পরম সমাদরে সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার পদ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক পরিবারের সকলে পান করিলেন। কয়েকদিন সেই গৃহে অবস্থানের পর চাতুর্মাস্য ব্রতের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে ভট্টভ্রাতাদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি ৪ মাস তাঁহাদের গৃহেই অবস্থান করেন। শ্রীরঙ্গমে বহু ব্রাহ্মণের বাস—এক-একদিন এক এক বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে করিতে চারি মাস পূর্ণ হইল। নানা কথা আলোচনায় বেঙ্কট ভট্ট প্রভুর একান্ত অনুরক্ত হইলেন এবং পুত্র গোপাল সর্বদা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তাহার বয়স তখন ১০ বৎসর। প্রভু এই বালকের ভিতর মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। সেইদিন হইতেই বালক যেন গৌরাঙ্গের পোষাপাখী হইলেন। সঙ্গে থাকিয়া কটাক্ষ মাত্র আজ্ঞা পালন, আজ্ঞার অপেক্ষায় তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রভু তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং প্রাণপণে পিতামাতা ও পিতৃব্যদিগের সেবা করিতে বলিলেন। তাঁহাদিগের কালপ্রাপ্তি হইলে তিনি যেন বৃন্দাবনে যান —তথায় বহু ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে—এই আশ্বাস দিয়া তাহাকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষাদান করিলেন এবং বিদায় কালে তাহার পিতাকে কহিলেন, "পড়াইয়া ইহাকে সুপণ্ডিত করিবে এবং ইহার বিবাহ দিবে না।"

ইহার পর গোপাল আর বিংশাধিক বর্ষ গৃহাশ্রমে ছিলেন, তন্মধ্যে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন এবং প্রভুর উপদেশ মত মন্ত্রজপ ও সাধনভজন করিয়া সাধনপথেও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। পিতৃমাতৃ-বিয়োগ পর্যন্ত গৃহে থাকিয়া পুত্রের ধর্ম প্রতি-পালন করিলেন এবং তাহার পর (১৫৩১ খ্রীঃ) বৃন্দাবনে গিয়া

পিতৃব্যের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া ভক্তিধর্ম মানিয়া লইলেন এবং প্রভুর শিষ্য হইয়া প্রবোধানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। গোপাল যখন ব্রজধামে পৌঁছিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রবোধানন্দের কুটীরে গেলেন তখন রূপ-সনাতন শ্রীধামে সর্বেসর্বা। প্রবোধানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রকে উহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহারা গোপালের বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট হইতে পূর্বেই পাইয়াছিলেন। গোপাল তখন "কান্থা করাঙ্গিয়া" নিষ্কিঞ্চন ভক্ত। গোপালের আগমনবার্ত্তা নীলাচলে প্রেরণ করা হইল। মহাপ্রভু নিজহস্তে রূপ-সনাতনকে চিঠি দিয়া জানাইলেন তাঁহারা যেন গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার তুল্য জ্ঞান করেন। আর গোপালকে তাঁহার আশীর্বাদ স্বরূপ নিজের বসিবার আসন ও ডোর কৌপীন বহির্বাস দিয়া পাঠাইলেন। গোপাল যখন শুনিলেন প্রভু তাহার কথা স্মরণ করিয়া স্বহস্তে পত্র এবং আশীর্বাদ স্বরূপ নিজ ব্যবহৃত পিঁড়া, ডোর কৌপীন বহির্বাস দিয়াছেন তখন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। প্রভুর আসনে প্রথমে বসিতে চাহিলেন না কিন্তু ভক্তরা যখন বুঝাইলেন তখন তিনি প্রভুর আসনে বসিলেন। এই আসনখানি একখানি কৃষ্ণবর্ণ কাঠের ক্ষুদ্র পিঁড়া, উহা এখনও ৺রাধারমণের মন্দিরে ভক্তিতে পূজিত হইতেছে।

মহাপ্রভুর যেমন আজ্ঞা তাহাই হইল ; সনাতন ও রূপ গোপালকে নিজ অনুজের মত স্নেহাকর্ষণে আবদ্ধ করিলেন। রূপ-সনাতন উভয়ে যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত ছিলেন, গোপাল ভট্ট সেই কার্যে উহাদের সহযোগী হইলেন। একত্র বসিয়া আলোচনা না করিয়া, একমত না হইয়া উহারা কেহ কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতেন না।

গোপাল বৃন্দাবনে আসার কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল মহাপ্রভু নীলাচলে অপ্রকট হইয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনের ভক্তেরা ভাবিলেন প্রভু যখন গোপাল ভট্টের জন্য আসন পাঠাইয়াছেন তখন গোপাল বাস্তবিকই গুরুর আসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র। সকলে সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে শ্রীসনাতন বৈষ্ণবস্মৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন। গোপাল আসিবামাত্র তাহাকে প্রধানতঃ সেই কার্যে ব্রতী করিলেন।

সনাতন তাঁহারই নামে বিখ্যাত স্মৃতি গ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাস" প্রকাশ করিলেন এবং নিজে গ্রন্থের বিশদ টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থের প্রামাণিকতা সুদৃঢ় ও সুবোধ্য করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার সময় দুইখানি সুপ্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন, উহার একখানি ব্রহ্মসংহিতা, অন্যখানি বিল্বমঙ্গল প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নানা তীর্থে দেবমন্দিরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ এই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথি পাঠ করেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী এই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণবল্লভানামী টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যের অবতারবাদ প্রতিপন্ন করিবার মানসে গোপাল ভট্টই প্রথম কতকগুলি দার্শনিক সন্দর্ভ রচনা করিতেছিলেন। উহা অবশেষে সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রচারিত করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাই শ্রীজীবের প্রসিদ্ধ ষট সন্দর্ভের মূল।

গোপাল ভট্ট উত্তর দেশে তীর্থ ভ্রমণ কালে গণ্ডকী নদীগর্ভে একটি শালগ্রাম শিলা পাইয়াছিলেন। উহা আনিয়া নিত্য পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, একদা এক ধনী ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া প্রধান প্রধান বিগ্রহকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দেন। গোপাল মনে করিলেন তাঁহার শালগ্রাম হস্তপদবিশিষ্ট হইলে তিনিও বস্ত্র ও অলঙ্কার পাইতেন। পরদিন দেখা গেল শালগ্রামটি হস্তপদবিশিষ্ট হইয়াছে। ইনি শ্রীরাধারমণ। এ সম্বন্ধে অন্য একটি কাহিনী আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড় হইতে প্রস্তর আনাইয়া উপযুক্ত কারিগর আনিয়া রাধারমণ বিগ্রহ প্রস্তুত করান। এই বিগ্রহ আকারে ছোট। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের ভয়ে জয়পুরে নীত হয় নাই। পূজারীরা বৃন্দাবনেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

পশ্চিম দেশীয় ভক্তগণ অনেকে গোপালের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন শ্রীনিবাস আচার্য্য, যিনি বঙ্গদেশে যাইবার কালে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুরে লুণ্ঠিত হয় ও পরে রাজা হাম্বীরের সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া রাজসন্নিধানে নীত হয়। শ্রীনিবাসের সহিত যোগাযোগ হইলে গ্রন্থরাজি তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হয় এবং রাজা ও প্রজাগণ অনেকেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হন এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তৎপর হন। বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্মের একটি পীঠস্থান হয়। গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ আসিলে সেই শেষ বারের মত অশীতিপর বৃদ্ধের বদনে হাসির রেখা দেখা গিয়াছিল। তখন তিনি জরাতুর দেহে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সময় সাধনভজনে এবং রাধারমণের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শেষের দিন নিকটবর্তী হইল। কোন শব্দ নাই, ক্লেশ নাই, চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ঠিক একশত বর্ষ পরে ৮৫ বৎসর বয়সে ১৫০৭ শকের আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেই মহাত্যাগী মহাপুরুষ গোপাল ভট্ট নেত্র নিমীলন করিলেন। বৃন্দাবন তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

শ্রীগৌরাঙ্গ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। পথে তালখড়ি গ্রাম হইতে লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া পদ্মাপারে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি একদা পদ্মাতীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে উপনীত হন। ঐ স্থানে তপন মিশ্র নামে একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—যেন একজন কেহ দেবমূর্ত্তিতে উদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতেছেন,—

নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহ কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহ নর নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁহার জগৎ কারণ॥

(চৈতন্যভাগবত, আদি ১২ শ)

স্বপ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, নিমাই পণ্ডিত শ্রীভগবানের অবতার। তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলে ভবার্ণব পার হইবার ভয় থাকিবে না। সেই আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নিমাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত ও নিজের একান্ত বাসনা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। নিমাই নিজের অবতারত্বের বিষয় কখনও সমর্থন করিতেন না। তিনি শুনিবা মাত্র প্রথমেই স্বপ্নবৃত্তান্ত অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিলেন, এবং মিশ্রকে কলির যুগধর্ম যে হরিনাম কীর্ত্তন, তৎ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রোপদেশ দিলেন। তপন মিশ্র যখন তাঁহার সহিত নবদ্বীপে যাইবার ব্যগ্রতা জানাইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে নবদ্বীপে না যাইয়া কাশীধামে যাইবার উপদেশ দিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত যখন মিশ্রের দেখা হইবে তখন তিনি সাধ্য সাধনের উপদেশ পাইবেন।

এই উপদেশ বলে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীধামে যান। তথায় ১৪২৭ শকে ধার্মিকপ্রবর তপন মিশ্রের এক পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহারই

নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য। ইঁহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় না। কয়েক বৎসর পর অকস্মাৎ একদিন কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে তপন মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের দেখা পাইলেন। তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। যে দুই মাস মহাপ্রভু কাশীতে ছিলেন, তিনি তাঁহার এক প্রিয় ভক্ত বৈদ্যবংশীয় চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেন, এবং আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। তপনপুত্র বালক রঘুনাথ তখন প্রাণপণে নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন, তাঁহার পাতের প্রসাদ খাইতেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট মার্জন করিতেন এবং তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পাদ সম্বাহন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এইভাবে বালক রঘুনাথকে আত্মসাৎ করিলেন।

প্রভু কাশী হইতে নীলাচলে গেলেন। বালক রঘুনাথ তাঁহাকে ভুলিতে পারিল না, তাঁহার সঙ্গ লাভের পর কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিল। কাশীতে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট তাঁহার শিক্ষা চলিতে লাগিল। ক্রমে বালক যুবক হইলেন। তাঁহার পিতামাতা বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইলেন। রঘুনাথ শাস্ত্র পড়িলেন, পণ্ডিত হইলেন কিন্তু নীলাচলের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট ছিল। অবশেষে রঘুনাথ একদা এত ব্যাকুল হইলেন যে, মহাপ্রভুকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পিতামাতার অনুমতি লইয়া রথযাত্রীদিগের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে তাঁহার নিজ বস্ত্রাদি ও প্রভুর জন্য কাশীর কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য এক ঝালি পুরিয়া পুরী চলিলেন। ঝালি বহন করিবার জন্য রামদাস বিশ্বাস সঙ্গী হইল। রঘুনাথ অষ্টপ্রহর রাম নাম করেন।

পুরীতে পৌঁছিয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের কুশল প্রশ্ন করিলেন। প্রভু তাহার জন্য এক বাসা করিয়া দিলেন, ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ রথযাত্রা হইতে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত আট মাস মহোল্লাসে বাস করিলেন। নানা

গুণের মধ্যে রঘুনাথের রন্ধননিপুণতা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন।

আট মাস পর মহাপ্রভু তাহাকে বিদায় দিলেন। যাইবার কালে তাহাকে তিনটি উপদেশ দিলেন—'বিবাহ করিবে না, একান্তভাবে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিবে এবং কোন বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভালভাবে ভাগবত অধ্যয়ন করিবে।' সর্বশেষে একবার নীলাচলে আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন।

কাশীতে আসিয়া একজন ভক্ত বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট নিয়ত ভক্তিভাবে ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন। চারি বৎসরের মধ্যে একে একে তাঁহার পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহাদের শ্রাদ্ধকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া অকৃতদার রঘুনাথ এ জীবনের মত সংসার ত্যাগ করিলেন।

সর্বপ্রথমে তিনি পুনরায় নীলাচলে আসিলেন এবং সেখানে পুনরায় প্রভুর চরণ-প্রান্তে আট মাস কাল থাকিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি সকল শিক্ষা লাভ করিলেন। এবার সেই সংসারবিরাগী শিষ্যটিকে প্রভুর অদেয় কিছুই ছিল না। প্রভু তাহাকে পূর্ব হইতে চিনিয়াছিলেন; তিনি যে ভাগবতের উপযুক্ত পাঠক হইবেন, তাহা অনুমান করিয়া কয়েক বৎসরাবধি তাহাকে দিয়া সেই শাস্ত্র অধিগত করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে ভাগবতপাঠক রূপে প্রস্তুত করিয়া ভক্তগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য তাহাকে শ্রীধামে পাঠাইলেন। বিদায়ের কালে প্রভু তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন আর রঘুনাথ বারংবার প্রভুর চরণে গড়াগড়ি যাইতেছেন। প্রভু তাহাকে উপহার দিলেন—

"চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা
ছুটা পান বিড়া মহোৎসবে পাইয়াছিল।"

ইষ্ট দেবতার মত সেই দীর্ঘ মালা মাথায় করিয়া রঘুনাথ অবশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রঘুনাথ মহাপ্রভুর নির্দেশ মত বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের আশ্রয় লইলেন। উঁহারা চিরপরিচিতের মত এই নূতন ভক্তটীকে

আপন জন করিয়া গোস্বামীদের গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া লইলেন। রঘুনাথ আসিয়া ব্রজবাসীর জীবনে এক নূতন তরঙ্গ তুলিলেন। গোস্বামীরা ইষ্ট-সেবা, জপসাধন এবং গ্রন্থ লেখা লইয়াই থাকিতেন; তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্র-বিচারই অধিক হইত, সাধারণের নিকট ভক্তিপ্রচার তেমন হইত না। রঘুনাথ আসা অবধি শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানী বা মূর্খ, বৈরাগী বা গৃহস্থ—সর্বজাতীয় লোকের নিকট কৃষ্ণকথার রসমাধুর্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, সরল ভাষায় লীলার কথা সকলের পরমানন্দ-উপভোগের বিষয় করিয়া তুলিলেন। রঘুনাথের আগমনের অব্যবহিত পর হইতে প্রত্যহ বিকালে ৺গোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গনে ব্যাসাসন পড়িত, উহাতে উপবিষ্ট হইয়া রঘুনাথ মধুর কণ্ঠে ভাগবতী কথা সকলকে শুনাইতেন। রঘুনাথের ছিল ভাগবত পাঠকের উপযুক্ত গুণগুলি, —পাণ্ডিত্য, ভাব ও চিন্তাশীলতা, মধুর কণ্ঠ, মধুর মূর্ত্তি। সর্বোপরি তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। ভাগবত পাঠে বৃন্দাবনে নূতন ভাবতরঙ্গ উঠিল, গোস্বামী ও ভক্তেরা সকলে যোগদান করিতেন।

গোবিন্দজীর প্রথম মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং ভগ্নদশায় পড়িয়া ছিল। রঘুনাথ তাঁহার এক ধনী ভক্তকে কহিয়া গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং বিগ্রহের জন্য বংশী ও মকরকুণ্ডল প্রভৃতি মূল্যবান অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সম্মুখে সুন্দর জগমোহন গঠিত হইল। সেইখানে রঘুনাথ নিজ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছিলেন।

সনাতন গোস্বামী যখন পরিণত বয়সে তনু ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার অদর্শন সহ্য করিবার জন্য রঘুনাথ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। নীলাচল হইতে শেষ বিদায় কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদী চৌদ্দ হাত দীর্ঘ তুলসী মালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন; শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তিনি ঐ মালাগাছটী গলায় দিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। সেদিন ছিল ১৪৭৬ শকের আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি। ঐ তিথিতে প্রতি বৎসর বৃন্দাবনে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে রঘুনাথের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। গোস্বামীদিগের মধ্যে অপর কেহ এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক শাখাত্রয় পুনর্বিমুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছেন, সেই "মুক্ত" ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃক্ষেত্রগুলি একযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দু রাজত্বকালে এই স্থান তীর্থক্ষেত্র ছিল এবং দুইটী নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া একটী বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্বকালে এই অঞ্চল একটি বিস্তীর্ণ মুলুকে পরিণত হইয়াছিল। বার্ষিক বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে দুইজন মৌলিক কায়স্থ জমিদার হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস উহার ইজারা লইয়াছিলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাতাসহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহাদিগকে আপন ভ্রাতার মত দেখিতেন। মহাপ্রভু শিশুকালে উহাদিগকে দেখিয়াছিলেন এবং আজা বলিয়া ডাকিতেন। ঘনিষ্ঠতার জন্য নবদ্বীপের সকল সংবাদ দুই ভ্রাতা পাইতেন। বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদ তুল্য বসতবাটী ছিল। ভূমিকর মধ্যে নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া তাঁহাদের ৮ লক্ষ টাকা লাভ থাকিত এবং বিপুল বাণিজ্যাদির নানা জাতীয় শুল্ক হইতে তাঁহাদের আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত।

এই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হইয়াও তাঁহারা বিলাসে-ব্যসনে ডুবিয়া যান নাই। উভয় ভ্রাতাই সুপণ্ডিত ও ধার্মিক ছিলেন এবং সৎকার্যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া দানশীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া-

ছিলেন। রাম-লক্ষণের মত অভিন্নহৃদয় দুই ভ্রাতা—দেশভরা তাঁহাদের যশ—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবলমাত্র বহুকাল পর্যন্ত উভয়ে নিঃসন্তান ছিলেন। অধিক বয়সে কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধনের ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারই নাম রঘুনাথ দাস। বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই রঘুনাথ। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত রাজপুত্রই চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান তাঁহাদের ঘরে এক সাত্ত্বিক ধার্মিককে আনিয়া দিয়াছিলেন। রঘুনাথের মুখে, চাহনিতে, ভাবভঙ্গিতে এক শান্ত সুশীল সৌম্যভাব প্রকাশ পাইত; সুখাদ্যে অরুচি, বেশ-ভূষায় অনাদর, ক্রীড়া-কোলাহলে অতৃপ্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইতেন। বাল্যকাল হইতে রঘুনাথের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং পাঠাভ্যাসে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তখনও বঙ্গদেশে সংস্কৃতের বড় আদর ছিল। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। গোবর্দ্ধন প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতিতে পুত্রকে গুরুগৃহে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিলেন। বলরাম আচার্য মহাশয়ের বাড়ী নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামে ছিল। সেখানে অন্য শিক্ষার্থীর মত সাধারণ পানাহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালক রঘুনাথকে বিদ্যার্জন করিতে হইত।

আচার্য বলরাম কেবল পণ্ডিত নহেন, তিনি ধার্মিক ও সাধু-সেবক ছিলেন। রঘুনাথ গুরুর কাছে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার রচিত মধুময় স্তবাবলীর রচনাকৌশলে তাহা প্রমাণিত হয়। রঘুনাথের বয়স যখন ৯।১০ বৎসর তখন হরিদাস ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদপুরে উপনীত হইলেন। বলরাম তাঁহার নির্জনে সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য একটি কুটীরের ব্যবস্থা করিলেন। বালক রঘুনাথ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি হরিদাসের কুটীরে যখনই যান, তখনই দেখেন ঠাকুর হরিদাসের বিরাম নাই, অবসাদ নাই, দিবারাত্র নাম-জপ চলিতেছে। পরিণত বয়সে রঘুনাথের যে কঠোর ভজননিষ্ঠা জন্মিয়াছিল—দিবসে ৬০ দণ্ডের মধ্যে ৫৬ দণ্ড পর্যন্ত তাঁহার ভজনে কাটিত—সে নিষ্ঠার উৎপত্তি এইখানে। হরিদাসেরও সুদৃষ্টি রঘুনাথের

উপর পড়িল। তিনি সর্বদা অধ্যয়ন-নিরত সেই বালককে দেখিয়া আশীর্বাদ করিতেন। রঘুনাথকে বড় স্নেহ করিতেন। রঘুনাথের প্রাণে নূতন তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া হরিদাস ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

অল্প বয়সেই গৌরাঙ্গদেবের কথা রঘুনাথ শুনিয়াছিলেন, শুনিয়াই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর হিরণ্য-গোবর্দ্ধন শুনিলেন গৌরাঙ্গ কাটোয়ায় আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে গিয়াছেন। এই সংবাদে রঘুনাথ প্রায় বাতুল হইলেন। তিনি আর সেই নবীন সন্ন্যাসীকে না দেখিয়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া ছুটিয়া শান্তিপুরে আসিলেন এবং জীবনে এই প্রথমবার শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিলেন। রঘুনাথ আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। পরিচয় পাইবামাত্র প্রভু রঘুকে বড় আদর করিলেন। রঘুনাথ কয়েকদিন শান্তিপুরে থাকিয়া প্রভুর সঙ্গলাভ করিলেন, অদ্বৈতাচার্যের কৃপায় প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজনের সুযোগ পাইলেন। কি যেন এক অজ্ঞাত শক্তিতে উভয়ের প্রাণে-প্রাণে মিলন হইল। প্রভু নীলাচলে গেলে রঘুনাথ এক প্রকার উন্মত্তের মত অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং সর্বদাই পলায়ন করিয়া নীলাচলে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজার পুত্র, তাঁহার পলায়ন ব্যর্থ করিবার জন্য উপযুক্ত ১১ জন লোক নিযুক্ত হইল। তখন রঘুনাথ মনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন, তাঁহাদের কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। রঘুনাথ নিয়ম মত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সংসারে মন বসিল না। এই সময় (১৪৩৩ শকে) তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। অভিভাবকগণ অতঃপর তাঁহার বিবাহ দিলেন, কিন্তু রঘুনাথের কোন পরিবর্ত্তন হইল না; প্রভুর সহিত দেখা হওয়ার পর হইতে অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা লইয়া চারি বৎসর কাটাইলেন।

অতঃপর রঘুনাথ সংবাদ পাইলেন প্রভু রামকেলিতে সনাতন ও রূপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসিয়াছেন। সেই বার্ত্তা শুনিবামাত্র রঘুনাথ একেবারে ব্যাকুল হইলেন, তাহা দেখিয়া

হিরণ্য-গোবর্দ্ধন বহুলোক ও দ্রব্যাদি দিয়া পুত্রকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন। প্রভুর সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎ হইল, ফলে প্রভুর প্রতি আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইল, কেমন করিয়া রক্ষকের হাত এড়াইয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন এই একমাত্র চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

শ্রীচৈতন্য তাহাকে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি স্থির হও। তুমি বিষয়াবর্ত্তের মধ্যে স্থির হইয়া কর্ত্তব্য কর, ব্যাকুল হইও না। কর্ম তোমাকে করিতেই হইবে, সোপানের পর সোপান পার হইয়া তবে চরম পথের পথিক হওয়া যায়।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্য হন; যখন তখন গুরুর মুখের কথা শুনিয়া তিনি অনেক তথ্য জানিয়াছিলেন, অনেক গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিজ বাল্যজীবন সম্বন্ধে সেই সত্যনিষ্ঠ ভক্ত লেখক লিখিয়াছেন—

সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে কহে তারে আশ্বাস বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

এই উপদেশ বাণী শুনিয়া রঘুনাথ আশ্বস্ত হইলেন। প্রভু তাহাকে আরও বলিলেন, "রঘুনাথ, আমি নীলাচলে গিয়াই বৃন্দাবন যাত্রা করিব, ফিরিয়া আসিলে তখন তুমি কোন ছলে নীলাচলে যাইও।" এইবার রঘুনাথ শান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন, প্রভুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে লাগিলেন। সংসারে মন দিলেন, বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। পরিবারভুক্ত সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত বিষয়ের অধিকাংশ ভার তাঁহার উপর দিলেন।

এই সময় এক ঘটনা ঘটিল। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পূর্বে সপ্তগ্রামে এক মুসলমান চৌধুরী মোক্তাদার ছিলেন। তিনি নবাবকে উপযুক্ত

রাজস্ব দিতেন না। সেইজন্য নবাব হিরণ্যকে ঐ কাজের ভার দেন। সেই চৌধুরী এখন নবাবের নিকট অভিযোগ করিলেন হিরণ্য ১২ লক্ষ টাকা দিয়াও নিজে বহু টাকা ভোগ করেন। অভিযোগ পাইয়া নবাব হিরণ্যকে ধরিয়া আনিতে সৈন্যসহ উজীর পাঠাইলেন। পূর্বেই সংবাদ পাইয়া হিরণ্য পলায়ন করিলেন। নবাবের সৈন্যরা রঘুনাথকে বাঁধিয়া লইয়া গৌড়ে গেল। নির্ভীক রঘুনাথ গেলেন গৌড়ের কারাগারে। প্রত্যহ নবাব দরবারে আনিয়া ভর্ৎসনা করা হইত, নির্যাতনের ভয় দেখান হইত। অবশেষে রঘুনাথ একদিন সুলতানকে বলিলেন, আমার পিতা ও জ্যেঠা তোমার দুই ভাই। আমি তোমার পুত্রতুল্য; তুমি জ্ঞানী, তুমি দেশের রাজা, তুমি আমাদের পালন করিবে, তুমি নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে লোকে কি বলিবে? ভক্তের সুকণ্ঠে বিনয়গর্ভ বচন শুনিয়া নবাব হুসেন শাহের মন আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন, তোমার জ্যেঠা আট লক্ষ টাকা ভোগ করে। আমাকে আর কিছু দিতে বলিও। রঘুনাথ উদ্ধার পাইলেন। গৃহে আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন।

এই সময় নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদেশে মূর্খ, নীচ, পতিত সকলকেই কৃষ্ণনামের আনন্দে ভাসাইবেন বলিয়া পাণিহাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনমাস সেখানে থাকিয়া দেশের লোককে হরিনামে পাগল করিয়া তুলিলেন। সে বার্ত্তা রঘুনাথ শুনিলেন। তিনিই তখন প্রকৃতপক্ষে সপ্তগ্রামের মুলুকপতি, পাণিহাটী সেই মুলুকের অন্তর্গত, উহা সপ্তগ্রাম হইতে বেশী দূরে নহে। নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবার আশায় রঘুনাথ লোকজন ও যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া পাণিহাটিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় এক উচ্চ বেদিকার উপর ভাস্করতুল্য জ্যোতির্ময় নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া আছেন। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময় লোকে তাঁহার নাম করিল। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ এই ভক্তকে চিনিলেন কারণ শ্রীচৈতন্যের নিকট ইঁহার সকল সংবাদ পূর্বে শুনিয়াছিলেন। মধুর কণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন—"চোরা, দিলি দরশন,

আয় আজি তোর করিব দণ্ডন" (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৬)। রঘুনাথ থতমত খাইলেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় নিজ চরণ তুলিয়া দিলেন আর বলিলেন "চোরা, তুমি বিষয়ীর মত চলাফেরা কর, এদিকে তোমার ভিতর কৃষ্ণময়, তুমি আত্মগোপন কর, পলাইয়া পলাইয়া দূরে থাক, এ লুকোচুরি আর খাটিবে না, আজ তোমাকে দণ্ড দিব"—সেই দণ্ড অনুসারে "দধি চিড়া ভালমত খাওয়াও মোর গণে।"

রঘুনাথ মাথা পাতিয়া সে দণ্ড গ্রহণ করিলেন। বিচারক বা দণ্ডিত উভয়েরই ইচ্ছা বিষয়ীর অর্থের সদ্ব্যবহার হউক। রঘুনাথ দেশের মালিক, তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিলেন —অর্থ যাহা লাগে লাগুক—খাদ্যদ্রব্য চাই। অল্প সময়ের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ চিড়া, ভারে ভারে দধি ও দুগ্ধ এবং চিনি, কলা, ও পাত্রাদি সংগৃহীত হইল। নিত্যানন্দ প্রভু উহা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের উচ্চ রোলে আকাশ বাতাস সব যেন মধুময় হইয়া গেল। কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সশরীরে সে মহোৎসবে যোগদান করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার চড়ায় সমস্ত দিন ধরিয়া এই পুলিন ভোজনের বিরাট উৎসব চলিল। রঘুনাথকে দণ্ড দিবার ছল হইতে ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহাকে "দণ্ড-মহোৎসব" বলে। এখনও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পাণিহাটিতে সেই জাহ্নবীতীরে বটবৃক্ষ বেদিকায় রঘুনাথের স্মৃতিকল্পে চিড়াদধির দণ্ডমহোৎসব হইয়া থাকে। সেই সুবৃহৎ বটবৃক্ষ এখনও দীর্ঘজীবী হইয়া সর্বসমক্ষে প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। সেই উৎসবের দিনে রঘুনাথ নিজ অর্থের সদ্ব্যয় জন্য উপস্থিত বৈষ্ণব ও ভক্ত প্রত্যেককে নিম্নতম দুই টাকা হইতে একশত টাকা এবং সাত তোলা সোনা প্রণামী দিয়া সেদিন যে কত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা গণনা করা যায় না।

রঘুনাথ উৎসব হইতে প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু

বাটীর অভ্যন্তরে আর গেলেন না—রাত্রিতে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। রথযাত্রার কাল নিকটবর্ত্তী; বহু ভক্ত নীলাচলে যাইতেছিলেন। এদিকে রক্ষকগণ দিবারাত্রি সতর্কভাবে তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল—পলাইবার উপায় নাই। একদিন তাঁহার দীক্ষাগুরু রঘুনন্দন আচার্য আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। আচার্যের বাটীতে ঠাকুরসেবক ব্রাহ্মণটি দুই দিন ঠাকুরপূজা করিতে যান না। রঘুনাথ দেশের জমিদার তিনি বলিয়া দিলে কাজ হয়। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে আচার্য আসিয়াছিলেন। রক্ষকেরা সকলে নিদ্রিত। রঘুনাথ বলিলেন আমি ঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাহাকে পাঠাইতেছি, আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি ঠাকুরকে বলিয়া সেই মুহূর্তে নীলাচলের পানে ছুটিলেন এবং চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিলেন।

রাজপথ ছাড়িয়া অন্য পথে রঘুনাথ ছুটিতে লাগিলেন, ছুটিতে ছুটিতে ১৮ দিনের পথ ১২ দিনে অতিক্রম করিয়া রঘুনাথ পুরুষোত্তম-ধামে পৌঁছিলেন। পথে ৩ দিন মাত্র আহার করিয়াছিলেন, আর ৯ দিন উপবাসী ছিলেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য চরণে নিপতিত হইলেন। পরিচয় পাইবা মাত্র মহাপ্রভু সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুর প্রাণ জুড়াইয়া গেল, সকল কষ্টের সকল আকুলতার পরিসমাপ্তি হইল। প্রভু বলিলেন রঘুনাথ, "এইবার শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিয়া বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।" রঘুনাথ উত্তর করিলেন "আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না, জানি যে তোমার কৃপাই আমাকে উদ্ধার করিল।" প্রভু তখন স্বরূপ দামোদরকে কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥"

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ। পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী ভেটাদিয়া গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। নাম ছিল পুরুষোত্তম লাহিড়ী। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় কয়েকদিন ইঁহাদের গৃহে ছিলেন; ইনি কাশী হইতে

পাঠ সমাপন করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিত্য সঙ্গী হন। ইঁহাকে বলা হইত মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ; যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান তেমনই গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন এইরূপ ভজননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যতকাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন তিনি "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে পরিচিত ছিলেন।

রঘুনাথ নীলাচলে আসিবার কালে বহুদিন উপবাসে থাকিবার জন্য বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাহার পরিচারক গোবিন্দ রঘুনাথের দেখাশুনা করিতেন। প্রত্যহ সমুদ্র স্নান ও ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর পাতের প্রসাদ খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে রঘুনাথ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। নীলাচলে আসিবার সময় পথক্লেশে এবং অতিরিক্ত উপবাসে রঘুনাথের জ্বর হয়। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জ্বর ত্যাগ হইলে রঘুনাথের সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনের লোভ হয়। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। সেইজন্য মনেমনে নানারূপ সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন। পরে একদিন স্বরূপকে প্রভু বলেন, রঘুনাথ তাঁহাকে অতিরিক্ত ভোজন করাইয়াছে বলিয়া তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।

কয়েকদিন মধ্যে রঘুনাথ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলে স্বরূপকে দিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই এই কয়দিন মধ্যে প্রভু ত আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশই দিলেন না?" তখন—

"হাসি মুখে মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে নিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহ তাহা জানে॥

গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৬)

প্রভু মোটামুটি সকল কথাই বলিলেন, কেবল নিগূঢ় তত্ত্বশিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপের উপর। প্রভু যে উপদেশ দিলেন রঘুনাথ বর্ণে বর্ণে উহা প্রতিপালন করিতেন।

এদিকে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলে পিতামাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কুলীন গ্রামবাসী শিবানন্দ সেন প্রভুর আদেশে প্রতিবৎসর রথযাত্রীদিগের সকলের পথের ব্যয় ব্যবস্থা করিয়া উহাদের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেন। গোবর্দ্ধন অনুসন্ধানের জন্য দশ জন লোককে পত্র সহ শিবানন্দের কাছে পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ অন্য পথে যাওয়ায় শিবানন্দ সংবাদ দিতে পারিলেন না, কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন শিবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন তখন সংবাদ দিলেন রঘুনাথ নীলাচলে আসিয়াছেন এবং কঠোর জীবন যাপন করিতেছেন। পর বৎসর রথযাত্রাকালে গোবর্দ্ধন পুত্রের জন্য একজন ব্রাহ্মণ, একটী ভৃত্য ও চারিশত মুদ্রা পাঠাইলেন। অর্থ দ্বারা কি করিবেন রঘুনাথ বুঝিয়া পাইতেছিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, ঐ অর্থ প্রভুর সেবায় ব্যয় করিবেন। প্রতিমাসে দুইদিন নানা উপচারে প্রভুকে খাওয়াইতে লাগিলেন। দুই বৎসর পর ইহা বন্ধ হইল। স্বরূপের নিকট সংবাদ পাইলেন বিষয়ীর অর্থ লইয়া প্রভুর সেবা অন্যায় মনে করিয়া রঘুনাথ উহা বন্ধ করিয়াছেন। প্রভু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রঘুনাথ নিজের খাদ্য বিষয়ে কঠোর নিয়ম পালন করিতেছিলেন—উহাও ক্রমে কঠোরতর করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ দ্বারা প্রসাদ আনা ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন, মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচিত ভিক্ষা লইতেন।

কিছুদিন পর তাহাও ছাড়িয়া দিয়া মধাহ্নে সত্রে গিয়া মাঁগিয়া খাইতেন। ইহাতেও রঘুনাথের কঠোরতার সাধ মিটিল না। ইহাতে দোষ আছে—চাহিতে হয়, তিনি নিজে যেটা পাইলেন সেটা হয়ত অন্য একজন পাইত—তাহাকে বঞ্চিত করা হইল। শেষে দোকানীরা অবিক্রীত প্রসাদ পচিয়া গেলে ফেলিয়া দিত—পচা গন্ধে যখন গরুও খাইত না তখন রঘুনাথ উহা আনিয়া জল দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতেন। রাজপুত্র এবং একমাত্র পুত্র, রাজবাড়ীর বিলাসের মধ্যে কত সুখাদ্য খাইয়া মানুষ হইয়াছেন—এখন এই ছেঁড়া কাপড় পরিয়া গরুতেও যে অন্ন মুখে দেয় না তাহাই ধুইয়া সামান্য আহারে দিনপাত করিতেন। একদিন স্বরূপ আসিয়া এই ভাত খাইয়া বলিলেন 'রঘু, তুমি প্রতিদিন এই অমৃত ভক্ষণ কর, আমাদিগকে দাও না।' মহাপ্রভু গোবিন্দের নিকট সংবাদ পাইয়া আসিলেন, স্বহস্তে একগ্রাস লইয়া ভক্ষণ করিলেন। আর এক গ্রাস লইতে উদ্যত হইলে স্বরূপ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাড়িয়া লইলেন। এইরূপে নীলাচলে রঘুনাথের জীবন চলিতে লাগিল।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামে একজন ভক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন হইতে একটি গোবর্দ্ধন শিলা ও একছড়া গুঞ্জামালা আনিয়া পুরীতে মহাপ্রভুকে দেন। শিলাটি তিনি কখনও হৃদয়ে ধরেন, কখনও নাকে চোখে স্পর্শ করান, কখনও শিরে রাখিয়া অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতেন। পরে এই দুইটী দ্রব্য মহাপ্রভু ভজননিষ্ঠ রঘুনাথকে দান করেন এবং শিলাটিকে কৃষ্ণবিগ্রহের মত জল এবং দুইটী পত্র সহ তুলসী মঞ্জরীর আটটি দিয়া প্রত্যহ পূজা করিতে বলেন। স্বরূপ দামোদর আসনের জন্য একটি পিঁড়া, বসন ও আস্তরণের জন্য এক বিতস্তি প্রমাণ দুইখানি ক্ষুদ্রবস্ত্র ও জলের একটি কুঁজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বরূপ প্রত্যহ অষ্টকৌড়ি মূল্যের খাজা সন্দেশ গোবিন্দকে দিয়া পাঠাইতেন, উহাই রঘুনাথ শিলাটির ভোগ দিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গচরণ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া রঘুনাথ কায়মনোবাক্যে পূজা জপ ও সাধন ভজনে দিবসের ছাপান্ন দণ্ড অতিবাহিত করিতেন

আর চারি দণ্ডের মধ্যে আহার নিদ্রা শৌচাদি শেষ করিতেন। দিনের পর দিন এইরূপ কঠোর নিয়মে সাধন ভজন করিয়া রঘুনাথ ষোল বৎসর বৃন্দাবনে কাটাইলেন। সাধ্য সাধনের সকল তত্ত্ব তিনি স্বরূপের কাছে শিখিয়াছিলেন, তৎপর অকস্মাৎ (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হইলেন। অল্পদিন পরে স্বরূপ দামোদরও অন্তর্ধান করিলেন। নীলাচলের নীলাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। একান্ত শোকখিন্ন হইয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিলেন। প্রভুও তাঁহাকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ প্রভু ও স্বরূপের বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের চরণ বন্দনা করিয়া গোবর্দ্ধন পাহাড়ে উঠিয়া উহার অত্যুচ্চ শীর্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল না।

বৃন্দাবনে আসিবা মাত্র সনাতন ও রূপ আপনাদের তৃতীয় ভ্রাতার ন্যায় তাহাকে এমন স্নেহজালে আবদ্ধ করিলেন যে রঘুনাথ সে স্নেহের নিগড় কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে সনাতন ও রূপ রঘুনাথের মুখে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সর্বপ্রকার লীলা-সাধনার গল্প শুনিতেন। চৈতন্যলীলার প্রকৃত তত্ত্ব স্বরূপের মত কেহ জানিতেন না এবং তিনিও তাহার সারমর্ম প্রিয় ভক্ত রঘুনাথকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থায় গম্ভীরা লীলার গূঢ় রহস্য রঘুনাথ স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন যেমন যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তহৃদয়ে যে ভাবে উহার আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল তাঁহাই তিনি সবিস্তারে এই সময় রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামীদিগের নিকট অভিব্যক্ত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন বৃন্দাবনে ছিলেন এবং রঘুনাথের চরণপ্রান্তে সর্বদা বাস করিতেন। তিনি ঐ সকল কথার সারাংশ তাঁহার অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া গিয়াছেন।

মধুর রসের আলোচনা নীলাচলে যেমন স্বরূপ দামোদরের সহিত হইত, বৃন্দাবনে আসিয়া সেইরূপ আলোচনা রূপ গোস্বামীর সঙ্গে

হইতে লাগিল। এই তত্ত্বের প্রকৃত আলোচনা করিতে রূপের মত কেহ ছিলেন না, তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জ্বল নীলমণি" এই মাধুর্য্যতত্ত্ব লইয়া বিরচিত। শ্রীরূপ রঘুনাথের নিকট অনেক তত্ত্বের প্রত্যাক্ষানুভূত দৃষ্টান্তের কথা শুনিলেন এবং শাস্ত্রোদ্ধার করিয়া অনেক বিষয়ের সমর্থন পাইলেন।

রঘুনাথ যখন গোবর্দ্ধনে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন, রূপ গোস্বামী কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুঞ্জমালা ও গোবর্দ্ধন শিলা লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, নিত্য জল তুলসী দিয়া সেই শিলারই পূজা করিতেন, অন্য কোন বিগ্রহ স্থাপন করেন নাই। রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করিয়া কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলেন। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিরূপে ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রঘুনাথ সেই শৈলকে স্বচক্ষে দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন। গোবর্দ্ধন পাদদেশে—যেখানে একদিন শ্রীচৈতন্যদেব উপবেশন করিয়া শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নামক প্রাচীন তীর্থ সরোবরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে স্থানকে এখনও লোকে "উপবেশন-ঘাট" বলে, তাহারই অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন।

সনাতন গোস্বামী এই সময়ে খুব স্থবির। গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর মহাদেবের পার্শ্বে বৈঠান নামক স্থানে একান্তে বসিয়া সাধনভজন করিতেন। তিনি একদিন আসিয়া রঘুনাথকে বৃক্ষতলে বসিয়া জপসাধনে সমাধিমগ্ন দেখিলেন। চারিদিকে জঙ্গল। হিংস্র জন্তুগণ চলাফেরা করে। সনাতনকে তখন দেশের সকলেই চেনে। তাঁহার কথায় গ্রামবাসীরা রঘুনাথের একটী ভজন কুটীর বাঁধিয়া দিল। ঐ স্থানের নাম আরিট গ্রাম। কথিত আছে, অরিষ্ট নামক অসুর বৃষ রূপ ধারণ করিয়া ব্রজে মহা উৎপাত আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে তাহাকে বধ করেন। বৃষবধ করেন বলিয়া শ্রীমতীর তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতীর্থসলিলে স্নান করিতে হয়। এজন্য পদাঘাতে যেখানে সর্বতীর্থজল আনয়ন করেন তাহাই শ্যামকুণ্ড এবং ঐ কুণ্ডে

স্নান করিবার সময় শ্রীমতী ও তাঁহার সখীগণ শাস্ত্রবাক্য মতে যে স্থান হইতে মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া শ্যামকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করেন সেই স্থানই রাধাকুণ্ডে পরিণত হয়। শ্রীরাধার মহিমার সংস্পর্শে রাধাকুণ্ড অতীব পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাথ মথুরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলসমূহ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করেন। তদবধি শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দুইটী সুন্দর সরোবররূপে আরিট গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করে। কালক্রমে উহা মজিয়া নিম্নভূমি হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্য উহাদের বার্ত্তা ব্রজবাসীদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পান নাই। অবশেষে তিনি ধান্য ক্ষেত্রের স্বল্প জলে স্নান করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য কুণ্ডদ্বয়ের স্থানের ইঙ্গিত করেন। রঘুনাথ আসিয়া সেইসব সংবাদ শুনিলেন, ধ্যাননিরত হইয়া স্বীয় হৃদয়ে অনুভূতি করিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া স্বপ্নাবেশে উত্তর পাইলেন।

রঘুনাথ কুণ্ডদ্বয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু খনন কার্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথায় পাইবেন? সজলনেত্রে অবিরত ভগবানের কাছে লীলাকুণ্ড দুইটীর জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল, এক ধনী ভক্ত তীর্থস্থানে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বদরিকাশ্রমে গিয়া বহু অর্থ দিয়া শ্রীনারায়ণের চরণে প্রণাম করেন। সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, যেন কেহ তাহাকে বলিতেছেন "এই অর্থ লইয়া তুমি বৃন্দাবনে অরিষ্ট গ্রামে যাও, সেখানে এক ভক্ত চূড়ামণি রঘুনাথ দাসকে দেখিতে পাইবে। এই অর্থ তাহাকে দিয়া বলিবে শ্যামকুণ্ডের ও রাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করিয়া উহা জলপূর্ণ করিতে যেন ব্যয় করেন।" সেই ধনী ব্যক্তি তাহাই করিলেন। রঘুনাথ অর্থ পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভগবানের দান মাথায় লইয়া তাহা দিয়া কুণ্ডদ্বয়ের উদ্ধার সাধন করিলেন। শ্রীভগবান তাঁহার একান্ত ভক্তের কেবলমাত্র তাহার অভীষ্ট পূরণ করেন না। যখন প্রয়োজন হয় নিজে বহন করিয়া আনিয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেন।

কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় শ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলে মহারাজ বজ্রনাভ যে একটি পৃথক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন এবং যাহা প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা আবিষ্কার হওয়ায় শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত স্থান সম্বন্ধে গোস্বামীগণ, যাঁহারা রঘুনাথ দাসের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ব্রজমণ্ডলের সকল ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় জানিতে পারিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইল। কুণ্ড-দ্বয়ের কার্য শেষ হইলে কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া সরোবর দুইটীতে স্নান করিয়া পবিত্র হইল।

শ্যামকুণ্ডের কূল হইতে অনতিদূরে রঘুনাথের ভজনকুটীর নির্মিত হয়। তদীয় শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীর উহারই উত্তরে অবস্থিত। শ্যামকুণ্ডের উত্তর কূলের নাম পঞ্চপাণ্ডবের ঘাট। ইহার পর হইতেই সমগ্র অঞ্চলের নাম হইল রাধাকুণ্ড। উহা ক্রমেই একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইল। ভক্তবৃন্দের দ্বারা অসংখ্য মন্দির বা কুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইল; রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ, মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহের মন্দির নির্মিত হইল। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীবগোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামীগণের পৃথক পৃথক ভজন কুটীর তাঁহার ভজন কুটীরের নিকটেই ছিল। রঘুনাথ অক্ষুণ্ণভাবে নিজের প্রাত্যহিক সাধনভজনের নিয়মিত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথের কুটীরের কাছেই একটী কুটীরে বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডে দশম অধ্যায়ে নিজ গুরুর কথা লিখিয়াছেন—

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে করেন নিত্য প্রণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবনে।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোনদিনে॥

রূপ-সনাতন যতদিন ধরাধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট আসিতেন। শ্রীনিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী কিছুদিন রাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবা নিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥

যিনি দিবসে ৫।৬ দণ্ড সাধন ভজন করেন তাঁহার এই দৈন্যমণ্ডিত উক্তি শুনিয়া জাহ্নবাদেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রঘুনাথ কোন বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কৃষ্ণদাসকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনায় মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে ও পরে বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডে সাধন ভজন করিবার সময় তাঁহার প্রাণের কপাট খুলিয়া যাইত, অন্তরের উচ্ছ্বাস তাঁহার পাণ্ডিত্যের সাহায্য লইয়া সুললিত স্তবরাজিতে আত্মপ্রকাশ করিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থত্রয় সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ৫৯ পৃষ্ঠায় আছে—

রঘুনাথ গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তব মালা নাম, স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীদামচরিত, মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ আহার বিষয়ে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর তিনি অন্নও ত্যাগ করিলেন, ফল আর গব্য খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেন। বৃন্দাবনে আসিয়া গর্ব্যের মধ্যে অল্প পরিমাণ ঘোলই তাঁহার পানীয় জল। রাধাকুণ্ডে আসিয়াও এইরূপ আহারে দিন যাইত। কৃষ্ণদাস ব্যতীত অপর একটী ব্রজবাসী ভক্ত সর্বদা নিকটে থাকিয়া সুযোগ মত পাতার দোলায় ঘোল আনিয়া মুখের কাছে ধরিতেন, রঘুনাথ অন্তর্দশায় এমন বিহ্বল থাকিতেন যে, কি খাইতেছেন তাহা জানিতে পারিতেন না। এইভাবে তাঁহার প্রায় ২০ বৎসর গেল। এমন সময়ে সনাতন অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার শোকে রঘুনাথ এমন

কাতর হইলেন যে কিছুদিন সমস্ত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু জলপানে জীবন রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পর শ্রীরূপের অন্তর্ধানে কয়েকদিন জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমেই শরীর কৃশ ও দুর্বল এবং অস্থিচর্মসার হইল। যাহা হউক, শোকাবেগ ক্রমে কিছু শান্ত হইল—আরও ২৫।২৬ বৎসর অতিবাহিত হইল। জীবনপ্রদীপ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। কৃষ্ণদাস তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলেন। গ্রন্থ শেষ হইল। জীব গোস্বামী এই গ্রন্থ সহ অন্য গোস্বামীবৃন্দের রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রে গ্রন্থগুলি বৃন্দাবন হইতে, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ—এই তিন জন ভক্তের সঙ্গে বঙ্গদেশে পাঠাইলে, বিষ্ণুপুর হইতে গ্রন্থ চুরির সংবাদ আসিল—কৃষ্ণদাস সে শোক সহ্য করিতে পারিলেন না, রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিলেন—তখন রঘুনাথ তাঁহার অচেতন দেহকে কোন রকমে জল হইতে তুলিয়া পুত্রশোকাতুর পিতার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অচিরে কৃষ্ণদাস মহাপ্রয়াণ করিলেন। ইহার পর রঘুনাথ ধরাধামে আর বেশী দিন ছিলেন না। বয়স তাঁহার প্রায় ৯০ বৎসর। ১৫০৫ শকের আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথতে রাধাকুণ্ডতটে রঘুনাথ রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে শ্রীগুরুচরণে স্থান লাভ করিলেন।